Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৮

মাসিক
আত-তাহরীক
১১তম বর্ষ এপ্রিল ২০০৮ ইং ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ ঃ কুরআনিক বিধানের বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮' অনুমোদন করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৮ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতিমালা ঘোষণা করেন। নতুন এই নীতিমালায় উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম নির্ধারিত ১ঃ২ বা একজন পুরুষ সমান দু'জন নারী এই বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধারাতেও ইসলাম বিরোধী অনেক নীতিমালা সংযুক্ত করা হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে ঘোষিত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিপরীতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেমন হঠকারী, তেমনি অবিবেচনাপ্রসূত, অপরিণামদর্শী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণও বটে। বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা ও জঘন্যতম চ্যালেঞ্জ। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা নির্ধারিত অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক নবতর সংযোজন। তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বেমালুম প্রগতিপন্থী একশ্রেণীর নারীবাদীর ফাঁদে পা দিয়ে সরকার এই ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। যে নারীরা নিজেদের সুখ-শান্তির মূল নিয়ামক ইসলামের শান্তিময় ও ইনসাফপূর্ণ বিধানে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ইসলামের পর্দার বিধানকে এরা নারীর জন্য বৈষম্য মনে করে উপহাস করে থাকে। পশ্চিমা ধাঁচের নারী স্বাধীনতার নামে চরম বেহায়াপনা ও স্বেচ্ছাচারিতা এদেশে কায়েম করতে চায়। নারীকে ঘর থেকে টেনে বের করে তথাকথিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ এরা নিজেদের অস্তিত্ব ও অধিকারের পূর্ব ইতিহাসই জানে না। কে তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে? সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, সে খবরই রাখে না। এরা জানে না এদের সবক দাতা পশ্চিমা দেশগুলোর তথাকথিক নারী স্বাধীনতার হালচিত্র।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে, প্রতিটি সভ্যতা ও মতবাদ নারী অধিকার অস্বীকার করে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। মানবিকতার চরম অবমাননা ঘটিয়ে নারীর মর্যাদাকে অবনমিত করেছে। গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল ঘৃণার পাত্র। এদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হ'ত। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ছিল না তাদের কোন অধিকার। রোমান সমাজেও নারীরা ছিল চরমভাবে উপেক্ষিত। নারী কোন উপার্জন করলে সেটা গৃহকর্তাদের বাড়তি আয়ে পরিণত হ'ত। সমাজে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির মূল অন্তরায় বিবেচিত হ'ত নারী। হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না।

তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় আত্মাহুতি দিতে হ'ত। এখনো ভারতে কন্যা সন্তান সন্দেহে লাখ লাখ গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করা হচ্ছে। ইহুদীদের চোখে নারী ছিল সর্ব পাপের মূল। খৃষ্টান ধর্মযাজকরা নারীকে 'নরকের দ্বার' ও মানবের সকল দুঃখ-দুর্দশার হেতু বলে গণ্য করত। জাহেলী আরবে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল পণ্যদ্রব্যের মত। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর মাতাই হ'ত সন্তানের স্ত্রী। সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হ'ত। অপরদিকে বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা নারীরা সবচেয়ে বেশী স্বাধীন হ'লেও সেখানেই নারীরা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত ও সবচেয়ে বেশী ধর্ষিত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে দাম্পত্য জীবন সবচেয়ে বেশী ক্ষণস্থায়ী ও ডিভোর্সের হার সবচেয়ে বেশী। সেখানে প্রতি ৬ দম্পতির মধ্যে ১ দম্পতি পরস্পর মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন তার স্বামী বা ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতিত হয়। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে, ইংল্যান্ডে অতি আধুনিকা নারীদের ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পাঁচজনে একজন। সেখানে পরিবারগুলোর মধ্যে 'সিঙ্গেল মাদার' বা স্বামীহীন মায়ের পরিবার রয়েছে শতকরা ২২ ভাগ। সুতরাং পশ্চিমা স্বাধীন (?) নারীদের এ করুণ অবস্থা থেকে আমাদের দেশের নারীবাদীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা পশ্চিমা ধাঁচের বিবেকবর্জিত এই নারী স্বাধীনতা আমাদের দেশেও এরকমই এক কলুষতাপূর্ণ ও অভিশপ্ত সমাজ উপহার দিবে। তখন হয়তো আফসোসের অন্ত থাকবে না।

বস্তুতঃ ইসলামই একমাত্র নারীকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারীদের যথোপযুক্ত অধিকার নিশ্চিত করেছে। বিগত সভ্যতার নিগৃহীত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা সম্পন্ন এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত করেছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। একাধিক উৎস থেকে নারীর জন্য সম্পদ নির্ধারণ করেছে। একজন নারী স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন, দাদী, ফুফু হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পেয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত বিবাহের সময় কন্যাকে মোহরানা প্রদানের বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। আর এসবই নারীর একক মালিকানাধীন। এতে স্বামীর বা অন্য কারো অংশ নেই। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ প্রদান করলেও সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের উপর। অর্থাৎ পুরুষকে একদিক থেকে আয় করে ব্যয় করতে হয় বহু দিকে। অপরদিকে নারী একাধিক খাত থেকে আয় করলেও তার উপর ব্যয়ের কোন খাত নির্ধারিত নেই। সুতরাং ইসলাম নারীর সাথে বৈষম্য তো দূরের কথা; বরং নারীকে অধিক সুবিধা দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এতদ্ব্যতীত ইসলাম নারীকে মাতা, কন্যা ও স্ত্রী হিসাবে স্ব স্ব স্থানে পূর্ণ অধিকার সম্পন্ন এক মর্যাদাশীল রমণী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং তাদের সাথে সম্মানজনক ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের নির্দেশ প্রদান করেছে। মাতার মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে' *(আহক্বাফ ১৫)*। জনৈক ছাহাবীর 'সদাচরণ পাবার সর্বাধিক হকদার কে'? এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) তিনবার মায়ের কথা উল্লেখ করেন এবং চতুর্থবার পিতার কথা বলেন *(বুখারী, মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তার মধ্যে উৎকৃষ্টতম সম্পদ হ'ল সৎকর্মশীলা স্ত্রী' *(মুসলিম)*। তাছাড়া জাহেলী আরবে সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে ইসলাম চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছে। আল্লাহ বলেন, (স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কী অপরাধে তাকে হ'ত্যা করা হয়েছে'? *(তাকভীর ৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা সন্তানের মর্যাদা উল্লেখ পূর্বক এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে ক্বিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় উত্থিত হবে যে, আমি ও সে একত্রে থাকব' *(মুসলিম)*। এরকম অসংখ্য আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে প্রকৃত নারী নীতিমালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি নারী সম্পর্কে 'সূরাতুন নিসা' নামে পৃথক সূরা নাযিলের মাধ্যমে নারীর সামাজিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেন কোনভাবেই নারী বঞ্চিত ও উপেক্ষিত না হয়। সুতরাং ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করেছে এ দাবী মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

পরিশেষে বলব, সৃষ্টির জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে বিধান দিয়েছেন এর চেয়ে কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ আর কোন বিধান হ'তে পারে না। এ বিধানের যথার্থ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে অপার সুখ ও সর্বশান্তি। সুতরাং তথাকথিত নারীবাদী ও প্রগতিবাদীদের চাপের মুখে কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ যেকোন সিদ্ধান্ত দেশের চৌদ্দ কোটি মুসলমান কস্মিনকালেও মেনে নিবে না। অতএব সংশ্লিষ্টদের দ্রুত ফিরে আসার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। আমরা বর্তমান সরকারের নিকট জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা থেকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাসমূহ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাই। দাবী জানাই ইসলাম নির্ধারিত নারীর অধিকার সমূহ সমাজে বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেননা আমাদের সমাজে যৌতুকের মরণ ছোবলে মোহরানা প্রায় বিলুপ্তির পথে। কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তি থেকে যৎসামান্য দিয়ে বিদায় করার প্রবণতা ব্যাপক। স্থান বিশেষে কন্যাকে শতভাগ মাহরূম করার দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়। সুতরাং যেখানে নারীর ন্যায্য পাওনা আদায়ের কোন উদ্যোগ নেই, সেখানে নতুন করে বিতর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? সবশেষে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের উদ্দেশ্যে বলব, প্রগতি যদি পর্দাহীনতা হয়, প্রগতি যদি বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা হয়, প্রগতি যদি নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা ও যৌনাচার হয়, তবে এই প্রগতি আগামী প্রজন্মকে উপহার দিবে অগণিত জারজ সন্তান ও মরণব্যাধি এইডস। অতএব সময় থাকতেই সাবধান!! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

Contents

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তাবলী এবং খারেজী মতবাদ

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো বাস্তব সত্য, ছহীহ দলীল ভিত্তিক। এগুলোর কোন একটিতে যে পতিত হবে সে কাফের। ইসলাম ভঙ্গকারী বহু কাজ-কর্ম রয়েছে, যেগুলো কেউ করলে সে আর মুসলিম থাকে না। তন্মধ্যে অতি মারাত্মক ও প্রসিদ্ধ ১০টি ইসলাম বিধ্বংসী কাজ নিম্নে বিধৃত হ'লঃ

(১) আল্লাহ্‌র ইবাদতে শিরক করা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। তা ব্যতিরেকে অন্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(নিসা ১১৬)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ.

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এই সমস্ত যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৭২)*।

(২) যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মধ্যস্থতা সাব্যস্ত করে এবং তাদের উপরেই ভরসা রাখে, এই ধরনের ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বলে গণ্য।

(৩) যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের অভিহিত করবে না কিংবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

(৪) যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, অন্যের আদর্শ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের চাইতে অধিক পূর্ণাঙ্গ কিংবা এই বিশ্বাস করে যে, অন্যের বিধান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিধান অপেক্ষা অধিক উত্তম, (যেমন কেউ কেউ ত্বাগূতের বিধানকে নবীর বিধানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে) তবে সে ব্যক্তি কাফের বলে গণ্য হবে।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনিত কোন বস্তুকে যদি কেউ ঘৃণার চোখে দেখে তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে, যদিও সে ঐ বস্তুর উপর বাহ্যিকভাবে আমলও করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

'এটা এজন্যই যে, তারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়কে ঘৃণা করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলগুলোকে বাতিল করে দিয়েছেন' *(মুহাম্মাদ ৯)*।

(৬) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীনের কোন কিছুকে নিয়ে বা তার পুরস্কার কিংবা শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা পোষণ করবে সে কাফেরে পরিণত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ، لاَتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ.

'(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোন প্রকার ওযর-আপত্তির অবতারণা কর না। তোমরা ঈমান আনয়নের পর আবার কুফরী করেছ' *(তওবাহ ৬৫-৬৬)*।

(৭) যাদু-টোনা করা, কাউকে কারো থেকে ফিরানো বা কাউকে কারো সাথে সংযুক্ত করার কৌশল অবলম্বন, এসবই যাদু-টোনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি যাদু করবে বা তাতে রাযী হবে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলার বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَتَكْفُرْ.

'ঐ দু'জন (হারূত-মারূত ফেরেশতা) কাউকে শিক্ষা দিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এই কথা না বলতেন, নিশ্চয়ই আমরা (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং (আমাদের নিকট যাদু শিখে) কাফের হয়ো না' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

(৮) মুশরিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِىْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

'তোমাদের মধ্য হ'তে যে তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদেরকে হেদায়াত দান করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*।

(৯) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কারো জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আতের বাইরে থাকার অবকাশ রয়েছে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِىْ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহ্‌রা শাখা, কুয়েত।*

Contents

'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

(১০) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দ্বীন হ'তে বিমুখ থাকা, দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করা ও তদানুযায়ী কাজ না করা। এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিও কাফের বলে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ.

'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে বেশী যালিম (অত্যাচারী) হ'তে পারে, যাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াত সমূহ দ্বারা, অতঃপর সে উহা হ'তে বিমুখ হয়েছে? নিশ্চয়ই আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী' *(সাজদাহ ২২)*।

এ সমস্ত ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ে ঠাট্টাকারী ও আমলকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। বস্তুত এ সমস্ত ইসলাম বিধ্বংসী কাজ সবচেয়ে মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও তা অধিক হারে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল এসব থেকে সতর্ক থাকা এবং ভয় করে চলা।[১]

কিন্তু এগুলোর কোন একটি কোন মুসলিম ব্যক্তি করে ফেললে হুট করে তাকে কাফের বলে ফৎওয়া দেওয়া যাবে না। বরং তাকে কাফের বলার জন্য যে সকল শারঈ মূলনীতি রয়েছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেসব নীতিমালা অনুযায়ী যদি সে কাফের হয় তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, নতুবা বলা যাবে না। তবে তার কর্মটিকে নিঃসন্দেহে কুফরী কর্ম বলা যাবে।

এই বিষয়টি অতীব জটিল এবং কঠিন। কারণ একজন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির ফৎওয়া দেওয়ার অর্থই হ'ল সে জীবিত অবস্থায় থাকলে তার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। নিজ মুসলিম সন্তান-সন্ততির উপর তার অভিভাবকত্ব চলবে না। সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো ও তার জানাযা ছালাত আদায় করা যাবে না। তার জন্য মাগফেরাতের দো'আ করা ও মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার কোন মুসলিম আত্মীয়-স্বজন তার মীরাছ পাবে না।[২] বরং তার সমুদয় ধন-সম্পদ সরকারের বায়তুল মালে জমা হবে। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তার একমাত্র শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।[৩] পরকালে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে... প্রভৃতি।

আর যদি সে প্রকৃত অর্থে কাফের না হয় তবে কাফের ফৎওয়া দাতা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপকারী বলে গণ্য হবে। ফলে সে সর্বাধিক যালেমে পরিণত হবে। আর তার একমাত্র বাসস্থান হবে জাহান্নাম *(আন'আম ৯৩; আ'রাফ ৩৭)*। তাকে অন্যায়ভাবে কাফের বলার জন্য নিজেই কাফিরে পরিণত হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

'যে ব্যক্তি তার (দ্বীনী) ভাইকে বলবে, হে কাফের! তবে তাদের যে কোন একজন উহার সাথে প্রত্যাবর্তন করবে'।[৪] অর্থাৎ যদি তার দ্বীনী ভাই কুফরী ফৎওয়া পাওয়ার যোগ্য হয় তবে সে কাফের হবে, নতুবা ফৎওয়া দাতার উপরই তা বর্তাবে।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন। এজন্যই বড় বড় ওলামায়ে দ্বীন মুসলিম ব্যক্তিকে সহজে কাফের বলেন না, বরং সে ক্ষেত্রে বহু সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন।

এখানেই পদস্খলন ঘটেছে খারেজীদের। তারা যখনই জানতে পেরেছে যে, শরী'আতে অমুক অমুক বিষয়কে কুফরী বলা হয়েছে বা অমুক অমুক কাজ যে করবে সে কুফরী করবে। তখনই তারা ভেবে বসেছে যে, তাহ'লে ঐসব কুফরী কাজ সম্পাদনকারী কাফের। ফলে তারা ঢালাওভাবে যাকে তাকে কাফের বলে। এদেরই পূর্বসূরীরা মু'আবিয়া ও আলীর মধ্যকার সংঘাত নিরসনকল্পে এক পর্যায়ে আবু মূসা আশ'আরী ও আমর ইবনুল আছকে ফায়ছালাকারী হিসাবে নির্বাচন করার জন্য তাদের উভয়কে এবং উভয় পক্ষের সমর্থক লোকদেরকে কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছিল এবং উক্ত ফায়ছালা গ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীকেও তারা কাফের বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের হাতেই নির্মমভাবে শহীদ হন খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা ওছমান এবং চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)। তাদের দৃষ্টিতে তাঁরা ছিলেন বড় কাফের (না'ঊযুবিল্লাহি)। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ১০ জনকে তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন এই দুই মহান খলীফা তাঁদেরই অন্যতম।[৫]

খারেজীরা তাদেরকে কাফের প্রমাণ করতে গিয়ে দলীল হিসাবে এই আয়াতটিকে পেশ করেছিল إن الحكم إلا لله

১. *শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ ওয়ামা ইয়ুযা-দ্দুহা ওয়া নাওয়াকিযুল ইসলাম, পৃঃ ২৫-২৯।*
২. *ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪১ 'মাগাযী' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী হা/২৭৯৪, ৬৪১১।*
৪. *ছহীহ বুখারী হা/৫৬৩৯।*
৫. *আহমাদ হা/১৬১৭; আবুদাউদ হা/৪৬৪৯; তিরমিযী হা/৩৭৫৭; নাসাঈ হা/৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২।*

'ফায়ছালা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই' *(ইউসুফ ৪০, ৬৭)*। অথচ খারেজীরা আয়াতটির প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঝগড়া নিরসনের জন্য বিচারক নির্ধারণ করা আল্লাহ্র ফায়ছালার বাইরে নয়, বরং আল্লাহ্র ফায়ছালারই অনুকূলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য মহান আল্লাহ উভয় পক্ষ থেকে একজন একজন করে মোট দু'জন ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا،

'যদি তোমরা তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস (বিচারক) নিযুক্ত করবে' *(নিসা ৩৫)*।

কাজেই মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানোর স্বার্থে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক আবু মূসা আশ'আরী ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে বিচারক নির্ধারণ করা মোটেই আল্লাহ্র ফায়ছালার বহির্ভূত হয়নি, বরং সেটিই আল্লাহ্র ফায়ছালা সম্মত। কিন্তু মূর্খ খারেজীরা প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে কাফের ফৎওয়া দিয়ে তাদের জান ও মাল হালাল করে নিয়েছিল।

আজও ঐসকল খারেজীদের উত্তরসূরীরা তাদের পথ অবলম্বন করে কুরআন ও হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ঢালাওভাবে মুসলিমদেরকে কাফের ফৎওয়া দিয়ে তাদের জান, মাল ও ইযযত-সম্মান সব হালাল করে ফেলেছে। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে আলজেরিয়া, মিশর, সুদান, সঊদী আরব সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদের অপতৎপরতা।

আলজেরিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সে দেশে মাত্র চার বছরে সর্বমোট পঞ্চাশ হাযার মহিলার শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটেছে। খারেজীরা তাদেরকে কাফেরদের স্ত্রী-মেয়ে মনে করে দাসী হিসাবে ব্যবহার করেছে। এদের অনেককে তারা ধর্ষণের পর হত্যা করেছে। আবার গর্ভে সন্তান আসার আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর অনেককে হত্যা করেছে। অনেকেই অবৈধভাবে গর্ভবতী হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে।[৬]

উক্ত মন্ত্রণালয়ের তথ্য মুতাবেক সে দেশে খারেজীদের অপতৎপরতার কারণে ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাযার নিহত, ৬ হাযার লোক আহত, ৩১৪৩ টি ধ্বংসাত্মক কাজ, ১৫০০ সাধারণ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৪০টি সরকারী প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ৪০০০ ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের গাড়ী ধ্বংস করা হয়েছে। লোমাতীন পত্রিকায় পরিবেশিত তথ্য মতে, তাদের নাশকতামূলক অপতৎপরতায় মিলিয়ন ডলার পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯২ সালে ইসলামপন্থীরা ভোটে বিজয় লাভ করার পর তাদেরকে সরকার গঠন করতে না দেওয়ার জন্য ৪০ থেকে ৫০ হাযার মানুষের প্রাণ হানী ঘটেছে।[৭]

খারেজীরা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত বিভিন্ন ইমামকে হত্যা করেছে। একাধিক সরকারী জামে মসজিদে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। খারেজীদের চরমপন্থা অবলম্বন করে সরকারকে কাফের ফৎওয়া না দেওয়ায় এবং তাদের দলে শরীক না হওয়া তাদের হুমকির সম্মুখীন সেদেশের হক্বপন্থী সালাফীগণ, যাঁদের অনেকেই ঐসব চরমপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁদের অন্যতম হ'লেন মুহাম্মাদ আমীন জালফাবী, আব্বাস প্রমুখ। ঐসব চরমপন্থীদের জন্য এশা ও ফজর ছালাতে সালাফীগণ মসজিদে যেতে ভয় পান। তারা একাধিক আলেমকে মসজিদে যাওয়ার পথে বা মসজিদ থেকে ফেরার পথে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এখনও সালাফীগণ একের পর এক তাদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছেন। তারা শিশুদেরকে বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করেছে। এমনকি দুধ পান করাবস্থায় শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করেছে। ৭৫ বছরের বৃদ্ধাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। আর যাত্রী সহ গাড়ী পুড়িয়ে ফেলা, অস্ত্রাঘাতে মুসলিমদেরকে হত্যা করা তো তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ।[৮] উল্লেখ্য, ঐ দেশের রক্তপিপাসু খারেজীরা দুই ভাগে বিভক্তঃ

১. জামা'আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ। যদিও তাদের দলের নাম 'জামা'আতুল মুসলিমীন'। তারা নিজেদের দলভুক্ত লোক ব্যতীত আলজেরিয়ার শাসক-শাসিত, নর-নারী, ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকলকে কাফের মনে করে তাদের জান-মাল হালাল মনে করে। তাদের হাত থেকে সরকারী কর্মকর্তা, সেনা সদস্য থেকে শুরু করে মায়ের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশুও রেহাই পায় না।

২. অন্য দল শুধু সরকার ও সরকারী কর্মকর্তাদেরকে কাফের মনে করে ও তাদের জান-মাল হালাল মনে করে। এ দল আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ

(ক) 'আল-জাইশুল ইসলামী লিল ইনকায' (খ) 'জামাআতুদ দাওয়া ওয়াল ক্বিতাল'।

---

৬. *জারীদাতুল বায়ান আল-ইমারাতিয়্যা, ১৮/১১/১৪২০ ইং/গৃহীতঃ ছিলাতুল গুলু ফীত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।*

৭. *আল-উনফুস সিয়াসী ফীল জাযায়ের, পৃঃ ১৩১-১৩৫, গৃহীতঃ ছিলাতুল গুলু ফীত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ৩২৪।*

৮. *ঐ, পৃঃ ২৭১-২৭৪।*

মূলতঃ এরা সকলেই মুসলিমদের কাফির ঘোষণাকারী দল। এরা যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকে তাদেরকে কাফির জ্ঞান করেই।[৯]

একইভাবে খারেজীদের একটি দল মিসরে তাদের নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও দ্বীন কায়েমের নামে অনেক নাশকতামূলক অপকর্ম হচ্ছে। ১৯৯৩ সাল থেকে খারেজীদের জিহাদের নামে অপতৎপরতা শুরু হয়। ১৯৯৮ পর্যন্ত তাদের দ্বারা ১৩৬৯ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩৯৯ জন সরকারী সৈনিক, ৫০৯ জন খারেজী দলের সদস্য, ৩৬৮ জন সাধারণ নাগরিক এবং ৯৩ জন পর্যটক। তাদের কর্মকাণ্ডের নমুনা হচ্ছে সরকারী লোক ধরে নিয়ে গোপনে হত্যা করা, থানায় আক্রমণ করে পুলিশ হত্যা করা, সরকারী বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস, বোমা বিস্ফরণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সহ বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা চালানো।

অনুরূপভাবে সুদানেও এই চরমপন্থী দলটি বিভিন্ন নাশকতামূলক অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সালাফীদের কয়েকটি মসজিদ থেকে মাগরিব ছালাত শেষে ফিরার পথে মুছল্লীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করেছে।[১০] ঐসব আহত, নিহত লোক খারেজীদের চরমপন্থী মত ও পথের অনুসরণ না করায় তাদের টার্গেটে পরিণত হয়।

একইভাবে সঊদী আরবেও এরা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায়। ২০ জুমাদাছ ছানী ১৪১৬ হিজরীতে রিয়াদে আমেরিকান ক্যাম্পকে উদ্দেশ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৫ জন আমেরিকান ও ভারতীয় নাগরিককে হত্যা করে। অন্যান্য ৬০ জন আহত হয়। এরপর ৯ ছফর ১৪১৭ হিজরীর 'খোবার' শহরের আবাসিক এলাকায় ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ১৯ জন আমেরিকান নিহত এবং ৩৮৬ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে ১৭ জন সঊদী, ১১৮ জন বাঙ্গালী, ১০৯ জন আমেরিকান এবং ৪ জন মিসরী ও জরদানী নাগরিক।[১১]

রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত গ্রেফতারকৃত আসামী আব্দুল আযীয আল মিছাম সঊদী (২৪)-এর নিকট থেকে জানা গেছে, তারা মিসআরী ও উসামা বিন লাদেন ও মিসর, আলজিরিয়ার বিভিন্ন চরমপন্থী কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট পড়ত। তাছাড়া তারা এমন কিছু বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করত যাতে সঊদী আরবের শাসক ও সে দেশের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ'কে কাফের বলা হয়েছে। এসব বইয়ের অন্যতম হ'ল 'আল-কাওয়াকিবুল জালিয়্যাহ ফী কুফরিদদাওলাতিস সঊদিয়্যাহ', জর্ডানের চরমপন্থী খারেজী আবু ইছাম মাক্বদিসী প্রণীত 'মিল্লাতু ইবরাহীম' প্রভৃতি। ঐ সমস্ত বই-পুস্তক ও লিফলেটের ভিত্তিতেই তাদের চরমপন্থী আক্বীদাহ ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, সঊদী সরকার কাফের এবং সে দেশের উচ্চ ওলামা পরিষদ কাফের। তাদের অন্যতম হ'লেন আল্লামা শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এবং যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বীহ ইবনু উছাইমীন (রহঃ)। সঊদী আরবকে কাফের বলার কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে, এরা সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র শরী'আতের ফায়ছালা গ্রহণ করে না। জাতিসংঘের নিকট ফায়ছালা প্রার্থী হয় এবং অমুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্ব করে ইত্যাদি। আর সে দেশের উচ্চ ওলামা পরিষদের অন্যতম সদস্য শায়খ ইবনু বায ও ইবনু ওছাইমীন (রহঃ) সম্পর্কে অভিযোগ হ'ল যে, তাঁরা এদেশের রাজা-বাদশাহদের সাথে শিথিলতা প্রদর্শন করেন এবং সঊদী রাষ্ট্রকে কাফের ফৎওয়া না দিয়ে আরো ভালবাসেন।[১২]

চরমপন্থী খারেজীদের মতে সঊদী সরকার কাফের, সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ কাফের অথচ সঊদী সরকারই একমাত্র ইসলামী সরকার যারা তাদের যমীনে আল্লাহ্‌র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, শিরকের আড্ডা সমূহ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভণ্ডপীর-পুরোহিতের আস্তানা, মাজারপূজা, জীব-জন্তুর পূজা যা ভারত, বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে চালু রয়েছে তারা এসবের অবসান ঘটিয়েছে। যাদের একমাত্র সংবিধান হ'ল কুরআন ও হাদীছ। যাঁরা এখনও হত্যার বদলে হত্যা, ডাকাতী, চুরির শাস্তি বিধান বলবৎ রেখেছে। প্রতিটি যেলায় যেলায় ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে, যেখানে শরী'আত সম্মত বিচারকার্য পরিচালিত হয়। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর মত বিদগ্ধ পণ্ডিত যে দেশের প্রধান মুফতী...। তাদেরকে হুট করে কাফের বলে ফৎওয়া দেওয়া খারেজীদেরই কাজ বৈকি? এরাও পূর্বসূরী খারেজীদের অনুসরণে সে দেশের বিজ্ঞ ওলামা পরিষদকে কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছে। অথচ তাঁদের দোষ একমাত্র এই যে, তাঁরা কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের পথ অনুসরণ করেই সে দেশের রাজা বাদশাহদেরকে ইসলামী দিক নির্দেশনা সহ সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইসলামী বিভিন্ন বিধান সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার পিছনে তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁরা তাদের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি সালাফে ছালেহীনের আদর্শ মুতাবেক মার্জিতভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করে থাকেন। এই কারণেই ঐসব আধুনিক খারেজীদের নিকট তারাও কাফের। তাদের পূর্বসূরী খারেজীরা যেমন ছাহাবীদের মত উঁচু মাপের ব্যক্তিদেরকে

৯. *ফাতাওয়া আল-ওলামাইল আকাবির ফীমা উহদিরা মিন দিমাইন ফীল জাযায়ের, পৃঃ ১০-এর বরাতে 'ছিলাতুল গুলু ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ২০৩-২০৪।*

১০. *ছিলাতুল গুলু ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।*

১১. ছিলাতুল গুলু ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ২৯১-২৯২।

১২. *আল-উনফুস সিয়াসী ফীল জাযায়ের, পৃঃ ১৩১-১৩৫, গৃহীতঃ ছিলাতুল গুলু ফীত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ৩২৮।*

কাফের ফৎওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, ওছমান ও আলীর মত জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত বিজ্ঞ ছাহাবীদেরকে হত্যা করেছিল। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান যুগের খারেজীরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে সঊদী আরবের সরকার থেকে শুরু করে সে দেশের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ'কে কাফের বলতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি।

যারা সঊদী আরবের মত ইসলামী দেশের সরকার, ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে কাফের মনে করে, তারা আর কোন্ দেশের সরকার ও ওলামায়ে দ্বীনকে মুসলিম মনে করবে? হ্যাঁ তাদের কুফরী ফৎওয়া থেকে তারাই রেহাই পাবে, যারা তাদের মতই মূর্খ ও উগ্রমেযাজী, বোমাবাজ, যারা তাদের মতই জিহাদের নামে মুসলিম নারীদের দাসী ভেবে নারী ধর্ষণ, নারী ও শিশু হত্যা, সরকারী স্থাপনা ধ্বংস, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ-আর্মি, নিরীহ জনগণ এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মসজিদের ইমামকে হত্যা করার পক্ষপাতি। এক কথায় যারা তাদের মতই চরমপন্থী খারেজী মতবাদে বিশ্বাসী কেবল তারাই তাদের কুফরী ফৎওয়া থেকে রেহাই পাবে। আল্লাহ এসব মূর্খ চরমপন্থীদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং যমীনকে এদের ফিৎনা-ফাসাদ থেকে চির পবিত্র করুন!

বাংলাদেশের পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে চরমপন্থীদের অপতৎপরতা শুরু হয় আনুমানিক ১৯৯০/১৯৯১ সালের দিকে। গোপনে গোপনে জিহাদের নামে তাদের অপতৎপরতা চলতে থাকে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ ১৯৯৮ সালে উত্থান ঘটে জেএমবি'র। এরপর জেএমজেবি ও হরকাতুল জিহাদের উত্থান হয়। চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৫ সালের ১৭ই আগষ্ট এক সাথে সারাদেশের পাঁচ শতাধিক পয়েন্টে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গীরা। ২০০৫ সালে জেএমবি, জেএমজেবি ও হরকাতুল জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন সরকার। জেএমবির শীর্ষ জঙ্গী নেতাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা হামলার পাশাপাশি আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ৩৩ জনকে হত্যা ও দুই শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে। এদের মধ্যে অনেকেই এখন পঙ্গু জীবন যাপন করছে। শীর্ষ জঙ্গীদের ধরার পাশাপাশি জঙ্গীদের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এক সাথে অভিযান চালায় র‌্যাব ও পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। জঙ্গী বিরোধী অভিযানে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ শক্তিশালী বিস্ফোরক, গ্রেনেড, অস্ত্র, গুলী ও বোমা তৈরীর নানা ধরনের উপকরণ। একই সময়ে গ্রেফতার করা হয় শীর্ষ জঙ্গী নেতা সহ অন্যান্য জঙ্গীদের।[13]

১৩. *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ মার্চ, ২০০৭ ইং শুক্রবার।

উল্লেখ্য যে, সরকারের এই অভিযান প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যখন ঢালাওভাবে নিরীহ-নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়। বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে উক্ত মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে সরকার এক চমৎকার নাটক সাজায়। হাস্যকর হল নিষিদ্ধ করা হয় জেএমবি ও জেএমজেবিকে, আর গ্রেফতার করা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আমীরকে। অথচ ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বহুপূর্ব থেকে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তার বক্তব্য ও লেখনী সবকিছুই জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে পরিষ্কার। বিগত সরকার প্রভাবিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ও তাঁর সংগঠনকে ফাসানোর জন্যই এই ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁর উপর যুলম নেমে আসার পর তাঁর সংগঠন আরো গতি লাভ করেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনিও সম্মানের সাথে মুক্তিলাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা সকলেই তার জন্য খাছ করে দো'আ করি আল্লাহ যেন তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখেন এবং দ্রুত মুক্তিদান করে দ্বীনে হক্ব-এর খিদমত পুরোদমে আঞ্জাম দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ করে দেন-আমীন!!

এইসব চরমপন্থীদের বিশ্বাস হ'ল, এদেশে বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড, শিরক-বিদ'আত সরকার কর্তৃক সংঘটিত হয়। এদেশের সংবিধান হ'ল ত্বাগূতী সংবিধান। কাজেই এদেশের সরকার কাফের। তাদেরকে যারা সমর্থন দিবে তারাও কাফের। বিশেষ করে এই সরকারের সহযোগী যেমন পুলিশ, আর্মি, আদালতের বিচারক সকলেই কাফের। এরাও পূর্ব যুগের খারেজীদের মত ব্যাখ্যা ছাড়াই মুসলিম সরকারকে উক্ত অজুহাত দেখিয়ে কাফের ফৎওয়া দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

উল্লিখিত দোষ-ত্রুটির প্রায় সবই সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক। আর সরকার মুসলিম হওয়ার জন্য নিজেরাই এসব স্বীকার করেন। বস্তুত কোন মুসলিমই বলবে না যে, সূদ খাওয়া, মদ পান ও পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া হালাল এবং আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানে ফায়ছালা করা বৈধ। এজন্যই তাদেরকে কাফের ফৎওয়া দেয়ার বিষয়টি সহজ নয়। তারা মূলতঃ কালেমা পাঠকারী মুসলিম। ব্যক্তিগত জীবনে তারা শরী'আতের অনুগত। এজন্য তাদেরকে হজ্জ, ওমরাহ করতে দেখা যায়। কালেমা, ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তিতে বিশ্বাসী ও যথাসাধ্য আমলকারী। বিবাহ-শাদী, তালাক, মীরাছ প্রভৃতি বিষয়ে তারা শরী'আতেরই অনুসরণ করে। জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করে। এর দ্বারা

বুঝা যায়, তারা শরী'আতে নীতিগতভাবে বিশ্বাসী এবং যথাসাধ্য আমলকারীও বটে। যদিও শয়তানের শৃঙ্খল থেকে এরা মুক্ত নয়। আর সে কারণ স্বার্থে ব্যাঘাত হবে দেখে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করে না। কাজেই তাদের ঐসব কিছু অপকর্মের জন্য হুট করে কাফের ফৎওয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তবে খারেজী মতাদর্শপুষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তাদেরকে কাফের বলা মোটেই বিচিত্র নয়। কেননা তাদের পূর্বপুরুষরা বড় বড় ছাহাবীদেরকেও কাফের ফৎওয়া দিয়েছে। ওছমান ও আলীর মত জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত মহান দুই খলীফাকে কাফের ফৎওয়া দিয়ে হত্যা করেছে। বরং সর্বযুগের, সর্বকালের খারেজীদের মূল নেতা 'যুল খুওয়াইসারাহ তামীমী' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও এই মর্মে অপবাদ দিয়েছিল যে, তিনি আদল-ইনছাফ করেন না, আল্লাহকে ভয় করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে সে বলেছিল, يَامُحَمَّدُ! اعْدِلْ 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়বিচার করুন'।[১৪] বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ন্যায়বিচার করুন'।[১৫] ইবনু মাজাহ প্রভৃতির বর্ণনায় এসেছে, সে বলেছিল, اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ইনছাফ করুন, কারণ আপনি ইনছাফ করেননি'।[১৬] সে আরো বলেছিল, اتق الله يا محمد 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন'।[১৭] অন্য বর্ণনায় আরো পাওয়া যায় যে, সে একথাও বলেছিল, وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ 'আল্লাহ্র কসম! এই বন্টন এমনই যাতে না ইনছাফ করা হয়েছে, আর না আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়েছে'।[১৮]

বাংলাদেশের সরকার সূদভিত্তিক অর্থনীতি চালু রাখা, মদ ও পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স প্রদান, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা না করার জন্য বড় ধরনের পাপ করছে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল ও তার অনুসারী মুনাফিকরা ছিল প্রকৃত মুনাফিক। এরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম মানতো কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ছিল ইসলাম বিরোধী। যাদের একাধিক কুফরী কর্মকাণ্ড নবী যুগে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। যাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তর *(নিসা ১৪৫)*। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، 'তারা (ঐ মুনাফিকরা) হ'ল শত্রু, অতএব তাদের থেকে সাবধান থাক' *(মুনাফিকূন ৪)*।

এরপরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি, যদিও তারা কাফেরের চেয়েও জঘন্য। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. 'হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন' *(তাহরীম ৯)*।

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি। তবে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র অত্র আয়াতকে অমান্য করেছেন? (না'ঊযুবিল্লাহ)। বরং তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদই করেছেন। তবে এই জিহাদ ছিল কাফেরদের সাথে জিহাদ করা থেকে ভিন্ন। এটা ছিল যবান দ্বারা জিহাদ। এই জিহাদ ছিল তাদের সংশয় খণ্ডন ও তাদের অপবাদের জবাব দেওয়ার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে যারা আসল কাফের তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশস্ত্র জিহাদ করেছিলেন।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা সংশয় খণ্ডন ও তাদের অপবাদের জবাব প্রদানের মাধ্যমে, অস্ত্র দিয়ে নয়।

অত্র আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয়ে উক্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা, তাদের সংশয় খন্ডন ও তাদের অপবাদের জবাব দেওয়া মাধ্যমে *(দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর, তাফসীর কুরতুবী প্রভৃতি)*।

বাংলাদেশে খারেজীদের অপতৎপরতাঃ

একাধিক সিনেমা হলে বোমা হামলা করে তারা অনেক মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। রাজনেতিক বিভিন্ন সভা, মিছিল-মিটিং-এ বোমাবাজী করে নিরীহ জনগণ, নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে। যদিও তাদের মূল টার্গেট ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা ও কর্মীরা। এ পর্যায়ে ঢাকায় তাদের গ্রেনেড ও বোমা হামলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিচারালয়ে কৌশলে ঢুকে বোমা মেরে বিচারকদেরকে নিধন করা। তারা ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠীতে আত্মঘাতী বোমা হামলা করে দু'জন বিচারককে হত্যা করেছে। তার কিছুদিন পর ঢাকার গাযীপুরের লাইব্রেরী উড়িয়ে দেয়, বেশ কয়েকজন নিরীহ জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেকে। তাদের বোমাবাজী এবং আত্মঘাতী বোমা হামলায় সর্বমোট ৩৩

১৪. *মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, হা/১৭৬১।*
১৫. *বুখারী হা/৬৪২১।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৮।*
১৭. *আহমাদ, ১৮/১৯১; বুখারী হা/৩৩৪৪; মুসলিম হা/১০৬৪; নাসাঈ ৫/৮৭-৮৮, হা/২৫৭৭, ৭/১১৮, হা/৪১১২।*
১৮. *বুখারী হা/২৯১৭।*

জনের প্রাণহানী ঘটে, আহত হয় দুই শতাধিক নিরীহ জনগণ। অথচ কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা কবীরাহ গুনাহ।[19] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاءه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا.

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেথায় সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(নিসা ৯৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ وَلاَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ.

'যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না, অন্যায়ভাবে যারা কোন মানুষ হত্যা করে না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যারা যেনা-ব্যভিচার করে না। আর যারা তা করবে তারা (বড় পাপের) সাক্ষাৎ করবে, তাদের আযাবকে দ্বিগুণ করা হবে' *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯)*।

আব্দুল্লাহ বিন আমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

'সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সহজ একজন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার চেয়ে'।[20]

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিধান শরী'আতে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

'যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও পাওয়া যায়'।[21]

[চলবে]

১৯. *বুখারী, 'আদব' অধ্যায় হা/৫৫২০, 'দিয়াত-রক্তপন' অধ্যায়, হা/৬৩৬৩; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১২৭-১২৮*।

২০. *নাসাঈ 'খুন হারাম করা' অধ্যায়, হা/৩৯২২; তিরমিযী 'রক্তপন' অধ্যায়, হা/১৩১৫, হাদীছ ছহীহ; দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৫০৭৭*।

২১. *বুখারী 'কর' অধ্যায়, হা/২৯৩০, 'মুক্তিপন' অধ্যায়, হা/৬৪০৩*।

অতিক্রান্ত তিনটি বছর

আমীরে জামা'আত আজও কেন কারাবন্দী!

আত-তাহরীক ডেস্ক

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ১লা নভেম্বর'০৭ থেকে স্বাধীন বিচার বিভাগের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বিচার বিভাগ। জনগণ বহু প্রত্যাশা নিয়ে স্বাগত জানিয়েছে এই ঐতিহাসিক পৃথকীকরণকে। কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা কি প্রাপ্তিতে রূপায়িত হয়েছে? এই প্রশ্ন এখন সকলের। ইতিপূর্বে আমরা আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে দৃঢ়তার সাথে বলেছিলাম, কেবলমাত্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নয়, সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুবিচারের নিশ্চয়তা এবং বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতার অবসান। প্রয়োজন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বিচার বিভাগ স্বাধীনের প্রায় অর্ধ বছর পূর্ণ হ'লেও এর উল্লেখযোগ্য সুফল এখনো জনগণ প্রত্যক্ষ করেনি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হালচিত্র পর্যবেক্ষণ করে অনেক আইনবিদের সাম্প্রতিক মন্তব্য হচ্ছে- বিচার বিভাগ কার্যত স্বাধীন হয়নি; বরং কাগজে কলমে হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বিচার বিভাগের সুফল জনগণ তখনই পাবে, যখন নির্দোষ মানুষের উপর থেকে নির্যাতনের খড়গ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে আর প্রকৃত অপরাধীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। নিরপরাধ মানুষ যেমন নির্যাতিত হবে না তেমনি প্রকৃত অপরাধীরাও যেন আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। তবেই সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এর দ্বারা আপামর জনসাধারণ উপকৃত হবে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বিচারের বাণী এখানে নিভৃতে কাঁদে। যদি সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহ'লে বিনা অপরাধে কাউকে বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকতে হ'ত না। মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যেত না মূল্যবান বছরগুলো। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যার জ্বলন্ত উদাহরণ। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবন্দী আছেন। তাঁর ও তাঁর সংগঠনের অবস্থান দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও এখনো তিনি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে জীবন যাপন করছেন। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে পূর্বাপর কিছু আলোচনা পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হ'ল।-

তিন বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তঃ

গ্রেফতারের প্রেক্ষাপটঃ

১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম এদেশে জঙ্গী তৎপরতার উত্থান ঘটে। এরপর ক্রমে তা সারাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ২০০০ সাল থেকে এদের নেতা হিসাবে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়। এদের এই অপতৎপরতা প্রত্যক্ষ করে আমীরে জামা'আত সর্বপ্রথম ২০০৩ সালে এই তৎপরতার বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন। ২০০৪ সালে 'ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি' নামক পুস্তকে এদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সরকারের প্রতি এদের কার্যক্রম বন্ধের জোর দাবী জানান।

বড় পরিতাপের বিষয় হ'ল ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী যেদিন আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়, তার ৮দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৪ তারিখে হঠাৎ জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে আমীরে জামা'আতের নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর ৭ দিনের মধ্যে অকস্মাৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে জে.এম.বি. কর্মী গ্রেফতার হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডঃ গালিবকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেছে বলে জাতীয় পত্রিকাসমূহে ফলাও করে প্রচারিত হয়। যদিও ইতিপূর্বে কখনোও দেশবাসী এ সম্পর্কিত সামান্য কোন রিপোর্টও পত্রিকার পাতায় প্রত্যক্ষ করেনি। এরপর থেকে বিস্ময়করভাবে ডঃ গালিব মিডিয়ার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হন। সাংবাদিকগণ সাংবাদিকতার সকল রীতি-নীতি ভুলে গিয়ে ভদ্রতার সকল সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁর বিরুদ্ধে বড় বড় কল্পিত রিপোর্ট রচনা করতে থাকে। এই হতবিহবল পরিস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৫ তারিখে আমীরে জামা'আত সংবাদ সম্মেলন করে এ মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানান। পরের দিন তা ভিন্নভাবে পত্রিকান্তরে প্রকাশ পায়। অতঃপর ২২ ফেব্রুয়ারী'০৫ তারিখ দিবাগত রাত ২ টায় স্বীয় বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর ২৩ তারিখে এক সরকারী প্রেসনোটের মাধ্যমে জেএমবি ও জেএমজেবি নামের দু'টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অথচ এই দুই সংগঠনের কাউকে সেদিন গ্রেফতার করা হয়নি। বরং গ্রেফতার করা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। একই সাথে গ্রেফতার করা হয় 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক

নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে। নিষিদ্ধ করা হ'ল এক সংগঠন, আর গ্রেফতার করা হ'ল অন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে! যে সংগঠন আল্লাহ প্রেরিত অহি-র আলোকে জীবন গঠনের দাওয়াত দিয়ে শান্তি পূর্ণভাবে সমাজে কাজ করে যাচ্ছে, যে সংগঠনের সকল কার্যক্রম প্রকাশ্য ও প্রশাসনের দোরগোড়ায় সম্পন্ন হয়, যে সংগঠনের রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য, রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ও পত্রিকা, যে সংগঠন এদেশে জঙ্গী তৎপরতার উত্থানকাল থেকেই সরকারসহ দেশবাসীকে সতর্ক করে আসছে, এমন একটি সংগঠনের প্রধানকে গ্রেফতার করে গোটা জাতির সামনে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে কলংকিত করার এটি ছিল এক জঘন্য প্রয়াস। এ দেশের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এত বড় প্রতারণা আর কোন ক্ষেত্রে হয়নি।

গ্রেফতার পরবর্তী অবস্থাঃ

গ্রেফতার পরবর্তী দৃশ্য ছিল এক কথায় নযীরবিহীন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে দেশের বিভিন্ন যেলায় পূর্বে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার সাথে ডঃ গালিবসহ নেতৃবৃন্দের নাম জড়ানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর নীলনকশা অনুযায়ী বিভিন্ন যেলায় মোট ১০টি মামলার সাথে তাঁর নাম সংযুক্ত করা হয়। যার মধ্যে ২টি হত্যা, ১টি ডাকাতি ও ৭টি বিস্ফোরকদ্রব্য ধারার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসর ও একজন স্বনামধন্য আলেমে দ্বীনের ব্যাপারে এ ধরনের ন্যক্কারজনক মামলা কত বড় ষড়যন্ত্রপূর্ণ তা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম। অতঃপর একের পর এক (২০দিন জে,আই,সি ও ৬+৪=১০দিন পুলিশ রিমান্ড) মোট ৩০দিন রিমান্ডে নিয়ে তাঁকে যারপর নাই হয়রানি করা হয়। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রফেসরকে হাতকড়া পরিয়ে বিভিন্ন যেলায় ও আদালতে হাযির করা হয়।

সংগ্রাম-প্রতিবাদের পথ পরিক্রমাঃ

আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের এই দুঃখজনক গ্রেফতারে সেদিন অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ভেবেছিল আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার মাটি থেকে চিরবিদায় নিল। মূলতঃ ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল অহী-র এই রাজপথকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধী আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইকে দেশবাসীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে সুকৌশলে আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর এই অপবাদ চাপিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ জীবন বাজি রেখে সারাদেশে আন্দোলন, মিছিল-মিটিং-সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই অপবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ঢাকার বুকে একাধিক জাতীয় সমাবেশসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। দেশের সর্বস্তরের আলেম-ওলামা সরকারের তীব্র নিন্দা জানান এবং বিভিন্ন সমাবেশে অংশগ্রহণ করে তাঁর মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হন। নিম্নে তাঁদের কতিপয় বক্তব্য উদ্ধৃত হ'ল-

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কুরআন-সুন্নাহ্‌র আন্দোলন এবং শিরক-বিদ'আত বিরোধী আন্দোলন। ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর জ্ঞানের পরিধি, ব্যক্তিত্ব, আপোষহীনতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সন্ত্রাসে বিশ্বাস করেন না এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনকেও সন্ত্রাসের পথে পরিচালনা করার কোন মানসিকতা রাখেন না। সন্ত্রাসের সাথে তাঁর দূরতম সম্পর্ক আদৌ ছিল না, এখনও নেই'।

তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ নেই, তিনি এসবের বিরুদ্ধে বই লিখেছেন, আত-তাহরীকে ফৎওয়া দিয়েছেন, বার বার এসব কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। সুতরাং অবিলম্বে তাঁকে সম্মানের সাথে মুক্তি দিয়ে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। নইলে ক্বিয়ামতের দিন মাযলূমের দো'আ হ'তে মুক্তি পাবেন না'।

'খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, 'ডঃ গালিব এদেশের গৌরব, জাতির সেবক। তাঁকে যামিন না দেওয়া সরকারের অন্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ'।

'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর আমীর মাওলানা হাবীবুর রহমান বলেন, 'ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ কায়েমের জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এ নিকৃষ্ট অভিযোগ আরোপ করেছে ইসলামের বন্ধু হিসাবে দাবীদার এ সরকার। মিথ্যাচার চালিয়ে যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিরীহ-নির্দোষ মানুষকে জেলে আটকে রাখতে পারে তাদেরকে আমি কোন মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সরকার বলতে পারি না'।

সরকারের কতিপয় বক্তব্য ও মামলার তদন্ত রিপোর্টঃ

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুয যামান বাবর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে রাজশাহীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেন যে, 'বোমা হামলার সাথে ডঃ

গালিব জড়িত নন' *(প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর'০৫)*।

বাবর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রেফতার হয়ে জেআইসিতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে আমীরে জামা'আতকে কিভাবে ফাঁসানো হয়েছিল তার বিবরণ তুলে ধরেন। যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ যে, ২০০৫ সালের ১৭ জানুয়ারী গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির সময় ৭ ডাকাত স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদেরকে ছিদ্দীকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের অনুসারী ও জেএমবি'র সদস্য পরিচয় দেয়। পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানালে তিনি মামলার এজাহারে জঙ্গী লিখতে বারণ করে ডাকাতির মামলা রেকর্ডের নির্দেশ দেন। ২ ফেব্রুয়ারী গোপালগঞ্জ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে তাদের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী নেয়া হয়। এই জবানবন্দীতেও তারা নিজেদেরকে জেএমবি'র সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে বাবরের নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে দেওয়া ৭ জঙ্গীর জবানবন্দী নথি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর গোপালগঞ্জের তৎকালীন যেলা প্রশাসক আব্দুর রঊফ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছালাউদ্দীনকে তার অফিস কক্ষে ডেকে এনে বলেন, জেআইসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে, জবানবন্দীতে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম লেখা যাবে না। বরং আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর ডিসির নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ছালাউদ্দীন ৫ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১-টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষে ঐ ৭ জনের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী পুনরায় রেকর্ড করে এবং ডঃ গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম অন্তর্ভুক্ত করে *(আমাদের সময়, ৫ জুন, পৃঃ ১)*।

তাছাড়া সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানার মামলায় প্রদত্ত ফাইনাল রিপোর্টে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহজাদপুর সার্কেলের এ.এস.পি জনাব আব্দুস সোবহান তদন্ত শেষে রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, 'পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশে আমি অত্র মামলার তদন্তভার ১০/৫/০৫ তারিখে গ্রহণ করি। তদন্তকালে আমি মামলার ঘটনাস্থল পুনরায় পরিদর্শন করি এবং সাক্ষীদের পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করি। (১) ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (২) আব্দুস সামাদ সালাফী (৩) নূরুল ইসলাম (৪) এ.এস.এম. আজিজুল্লাহদেরকে আদালতে হাজির করিলে দুই দফায় ২৫/৫/০৫ হইতে ৩১/৫/০৫ পর্যন্ত ৬ দিনের পুলিশ রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। পুলিশ সুপার সিরাজগঞ্জ কর্তৃক গঠিত যৌথ ইন্টারগেশন সেলের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ... জিজ্ঞাসাবাদের সময় উপরোক্ত আসামীদের দেওয়া বক্তব্য তথ্য স্থানীয়ভাবে যাচাই করার লক্ষ্যে নওদাপাড়া মাদরাসায় যাই এবং উক্ত মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মাদরাসা কমিটির লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং মাদরাসা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা গত ২০০৪ সন হ'তে অদ্যাবধি প্রকাশিত পত্রিকা সমূহ পর্যালোচনা করিয়া আহলে হাদিস আন্দোলনের অন্য কোন সশস্ত্র সংগঠনের যোগসূত্র পাওয়া যায় নাই এবং উক্ত মাদ্রাসায় কোন উগ্রপন্থী মৌলবাদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাক্ষ্য প্রমাণ বা তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।... জামালপুর আল মদিনা কিণ্ডার গার্ডেন হইতে গ্রেপ্তারকৃত ৪/৫ জন যাহাদেরকে জামালপুর মামলা নং- ২৩ তাং- ১১/১/০৫ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারা সংক্রান্ত যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদেরকে জামালপুর কারাগারে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছে। তাহারা জামাতে মুজাহেদীনের সদস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহাদের সাথে অত্র মামলায় ধৃত আসামী ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ অন্যান্য কাহারো উল্লেখিত আসামীদের সাথে বা আবদুর রহমানের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় নাই। এমনকি তাহারা এই বোমা হামলার সাথে জড়িত আছে মর্মে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া বগুড়া গাবতলী থানা, গাইবান্ধা পলাশবাড়ি থানা, নাটোর সদর থানা সমূহে যে সকল আসামী বোমা সহ ধরা পড়িয়াছে এবং আদালতে ১৬৪ ধারার জবানবন্দী দিয়াছে এবং তাহাদের নেতা ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দাবী করিয়াছে তদন্তকালে ইহার কোন সত্যতা পাওয়া যায় নাই।'

মামলার ভিত্তিঃ

৫৪ ধারা সহ মোট ১১টি মামলার ভিত্তিই হ'ল ১৬৪ ধারার একটি জবানবন্দী। যা বগুড়া যেলার গাবতলী থানার মামলা নং ৬৬/০৫ এ ধৃত আসামী শফীউল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। ১৪/২/০৫ তারিখে প্রদত্ত তার জবানবন্দীতে আমীরে জামা'আতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমীরে জামা'আতের বই পড়ে সে নাকি ইসলামী জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, একই শফীউল্লাহ ১৫ দিন পূর্বে শাহজাহানপুর থানার মামলা নং ৬১/০৫ এ প্রদত্ত ১৬৪ ধারা জবানবন্দীতে আমীরে জামা'আত সম্পর্কে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেনি। একই ব্যক্তির একই বিষয়ে প্রদত্ত একই ধারার দু'টি জবানবন্দীর মধ্যে এই বিস্ময়কর বৈপরীত্যে পরবর্তী যবানবন্দীটি যে সাজানো তা সহজেই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে পরবর্তী জবানবন্দীতে আমীরে জামা'আতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেভাবে

Contents

গোপালগঞ্জ যেলার মামলাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের নির্দেশে সাজানো হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত হাইকোর্টের গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে প্রদত্ত রায়ে শফীউল্লাহর উক্ত জবানবন্দী সম্পর্কে আরো পরিষ্কার বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং সেখানে শফীউল্লাহর যবানবন্দীকে 'অস্পষ্ট' (vague), 'কল্পিত' (imaginary), 'ভিত্তিহীন' (baseless) 'অযৌক্তিক' (unwarranted) এবং 'তথাকথিত' (so-called) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, (১৫ দিনের ব্যবধানে শফীউল্লাহ প্রদত্ত) "২৮/০১/০৫ ও ১৪/০২/০৫ তারিখে প্রদত্ত তথাকথিত স্বীকারোক্তিমূলক যবানবন্দী দু'টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অসংগতিপূর্ণ"।

আর জেএমবির সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করা সম্পর্কে হাইকোর্ট একই রায়ে বলেছে-

There is no material no record to show that Ahle Hadis movement is militant Islamic organization connected with the J.M.B.

'সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কোন উপাদান নেই যা প্রমাণ বহন করে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জে.এম.বি'র সাথে সম্পৃক্ত একটি জঙ্গী সংগঠন'।

অতএব মামলাগুলিতে যে কি পরিমাণ মিথ্যাচার করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রিয় পাঠক! এরকম জঘন্য মিথ্যার উপর ভিত্তি করে দেশের সম্পদ, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, একজন আলেমকে দীর্ঘ তিন বছর কারাবন্দী রাখা কত বড় অবিচার! এর চেয়ে বড় যুলম আর কিছু আছে কি? তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি কি কেউ পারবে ফিরিয়ে দিতে? সামান্য একজন ফেরিওয়ালার একটি সাজানো জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে একজন প্রফেসর দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কারাগারে আবদ্ধ থাকবেন, অথচ সারা দেশের কোটি মানুষের জবানবন্দীর কোনই মূল্য নেই? আলেম-ওলামার সত্যায়নের কোন গুরুত্ব নেই!

উল্লেখ্য, মামলাগুলির মধ্যে ৫টিতে ফাইনাল রিপোর্ট হয়েছে। অর্থাৎ মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আর বাকী পাঁচটির ১টিতে হাইকোর্ট থেকে ও ২টিতে জজকোর্ট থেকে তিনি যামিন পেয়েছেন। অবশিষ্ট দু'টি মামলা বর্তমানে ট্রায়ালে রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আমীরে জামা'আতকে গ্রেফতার থেকে শুরু করে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত উপরোক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, আমীরে জামা'আত গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবদ্ধ হয়েছেন। দ্বীনে হক্ব-এর এই নিরন্তর দাওয়াতকে চিরতরে স্তব্ধ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বহু পূর্বেই এর বীজ বপিত হয়েছিল। দেশের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র আমীরে জামা'আত অনুধাবন করতে পেরে তখন থেকেই এ ব্যাপারে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করেছেন।

দেশের সরকার ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত তাঁর জঙ্গীবিরোধী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্যের অংশবিশেষ এখানে পুনরায় উপস্থাপন করা হ'ল।-

জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রদত্ত বক্তব্যের অংশবিশেষঃ

সাতক্ষীরা, চিলড্রেনস পার্ক, ২৫ মে ১৯৯৮ঃ

'আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মান হামালা আলাইনাস সিলা-হ ফালাইসা মিন্না' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল না'। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল-কাতেলু ওয়ালমাকতূলু কিলা-হুমা ফিন-নার' অর্থাৎ 'হত্যাকারী এবং নিহত উভয় জাহান্নামী'। অতএব হাদীছ মাওজূদ থাকতে কেমন করে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারে? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না।'

রাজশাহী, তাবলীগী ইজতেমা ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ঃ

'রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকাল মানুষের সামনে কিছু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই।... মানুষের আক্বীদায় যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাকে বলে সে নিজে যদি না বুঝে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলব্ধি না করে, তাহ'লে শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব? কোনদিনই সম্ভব নয়। এর বাস্তব প্রমাণ সাড়ে ছয়শ' বছর ধরে দিল্লীতে মুসলমানরা সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল, হাতে অস্ত্র ছিল, বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না, যার প্রমাণ দিল্লীর দেওয়ানে খাছ, দেওয়ানে আম, আগ্রার তাজমহল, কুতুবমিনার, যার তুলনীয় একটা বিল্ডিং তৈরী করার ক্ষমতা ভারত সরকারের হয় নাই। এতকিছু দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মাইনরিটি আজও পর্যন্ত খোদ দিল্লীতে। তাছাড়া ১৯০ বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে, কই বাংলাদেশের মুসলমান বা হিন্দু ভাইরা কি খৃষ্টান হয়ে গেছেন নাকি? ১৯০ বছর ধরে শাসন

Contents

করেও তারা আমাদের আক্বীদার পরিবর্তন করতে পারেনি। বুঝা গেল রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, আর সশস্ত্র হুমকি দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষের সামনে আসে নাই। তাঁরা অস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আক্বীদা পরিবর্তনের দাওয়াত।... অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যমীনে যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা নবীদের মৌলিক তরীকার কাজটিই করে যাচ্ছে। আক্বীদা পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে।'

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলানায়তন, ঢাকা ২৫মে ২০০২ঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে গতকাল তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোন্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়? আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরো রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোকায় পা দিবেন না।'

রাজশাহী, তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩, ১৪মার্চ ২০০৩ঃ

'...আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের শ্লোগান দা'ওয়াত ও জিহাদ শুনে অনেকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ হয়ে গেছে যে, এদের হাতে মনে হয় অস্ত্র আছে। আমি এখানে উপস্থিত সকল ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কোন রকম সরকার বিরোধী জঙ্গী তৎপরতায় বিশ্বাস করে না।'

রাজশাহী ৫ নভেম্বর '০৪, প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবাঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এরা কখেনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। এরা কখনোই কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। মানুষকে জবরদস্তি করে, পিটিয়ে হত্যা করে, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, বোমা মেরে কস্মিনকালেও এরা মানুষকে হেদায়াতের দা'ওয়াত দেয় না। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায় মানুষকে আহ্বান করেছেন, সে তরীকায় আমরা মানুষকে আহ্বান করি। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কস্মিনকালেও বোমা মেরে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পারছে না। কাশ্মীরে বিগত ৫৬ বছর ধরে ভারত বোমা মারছে, কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১৯০ বছর এই বাংলাদেশে ইংরেজরা শাসন করেছে, ইংরেজরা কি আমাদেরকে ইংরেজ বা খৃষ্টান বানাতে পেরেছে? অতএব বন্ধুরা আমার! আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্পষ্ট বিশ্বাস এই যে, রাসূলের তরীকায় শান্তি। আপনার লেখনি আপনার বক্তব্য আপনার সংগঠন সবই হবে হক্বের পক্ষে।'

রাজশাহী ১৮ ফেব্রুয়ারী'০৫ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবাঃ

'...বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বালাদেশ' এই বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার কামনা করে। আর সেটা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী আবশ্যক। আল্লাহর রাসূল যেভাবে মক্কা ও মদীনাতে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ, যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্য, ইতিহাস তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছে।... আজকেও যারা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারকাযকে সন্ত্রাসের মারকায বানাচ্ছে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইমারতকে যারা নিকৃষ্টভাবে জঙ্গীবাদের সমর্থক মনে করেছে, মিথ্যা নিঃসন্দেহে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।'

তিনি আরো বলেন, 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাববাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্য আজ আমাদেরকেও তাদের সাথে শামিল করে ফেলা হয়েছে। আমি আহ্বান জানাব আহলেহাদীছ ভাইদেরকে, আহলেহাদীছ তরুণ ছেলেদেরকে, সাবধান হয়ে যাও, কোন চরমপন্থী

আন্দোলনে ঢুকবে না। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মার খেয়েছেন, নিজের দেহ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, নিজের দাঁত ভেঙ্গেছে, তিনি রাস্তায় রাস্তায় গিয়েছেন, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছেন, মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে, দারুনভাবে অপদস্ত করেছে তিনি কখনো একটি বদদো'আ পর্যন্ত করেননি।'

দুর্ভাগ্য, শেষোক্ত বক্তব্য প্রদানের মাত্র চারদিন পর তিনি যুলুমশাহীর হাতে গ্রেফতার হন।

শেষ কথাঃ

বর্তমানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। প্রকৃত অপরাধী আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই সহ জে.এম.বি'র শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করে তাঁদের ফাসির রায়ও বাস্তবায়ন করেছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধানে তৎপর হ'লেও কেন জোট সরকারের অন্যায় নির্যাতনের শিকার আমীরে জামা'আতের মুক্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না, সে প্রশ্ন আজ দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের অবসানের পর আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আত নির্দলীয় সরকারের আমলে দ্রুত এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক! ইতিমধ্যেই তাঁর জীবন থেকে মূল্যবান তিনটি বছর হারিয়ে গেছে। ইতিপূর্বে একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ ব্যাপারে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ অন্যায় ও যুলমের অবসানের জন্য জোর দাবী জানিয়েছি। কিন্তু কোন অদৃশ্য সুতোর টানে দেশবরেণ্য একজন আলেম ও দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শীর্ষস্থানীয় একজন প্রফেসরকে আজ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। নিরপরাধ মানুষের উপর যুলম-নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে, মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হ'লে সে দেশে কস্মিনকালেও শান্তি আসতে পারে না। এক্ষণে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনী প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলছি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর এই নিরপেক্ষ সরকারের আমলে যদি এ নযীরবিহীন যুলুমের অবসান না হয় তাহ'লে বুঝতে হবে এ দেশে ন্যায়বিচার পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। অতএব নিরপরাধ আলেমদের উপর থেকে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার সরিয়ে নিন। আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অবিলম্বে মুক্তি দিন। আল্লাহ আপনাদের সুমতি দান করুন! আমীন!!

নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

*মূলঃ মাওলানা নাসীম আখতার নদভী**

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

[নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে তোলপাড় হচ্ছে। চেষ্টা চলছে কুরআনিক আইন পরিবর্তনের। যদিও কুরআন নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, পৃথিবীর অন্যকোন ধর্মগ্রন্থ তা দেয়নি। সাথে সাথে সকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান দাবী করে সমঅধিকারের জন্য এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী তথাকথিত নারী উন্নয়ন কর্মীর পক্ষ থেকে চলছে জোরালো আন্দোলন। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় নারী পুরুষের সমান কি-না তা বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য নেপাল থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আস-সিরাজ' উর্দু পত্রিকা থেকে আলোচ্য নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হ'ল-অনুবাদক]

পৃথিবীতে মহিলাদের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ পৃথিবীর বড় সমস্যাবলীর অন্যতম। যে ক্ষেত্রে সর্বদা সীমাহীন বাড়াবাড়ি করা হয়। কখনো নারীদেরকে মানবতার নিম্নতর, নিকৃষ্টতর, প্রাণহীন-নির্জীবদেহ, অপবিত্রতা, অকল্যাণ, অমঙ্গল, অনিষ্টকর, নির্মূলকারী, বিধ্বস্তকারী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের চারণক্ষেত্র বা উৎসস্থল বলে অভিহিত করা হয়। আবশ্যকীয় বিড়ম্বনা, জন্মগত দ্বিধা-সংকোচ, সন্দেহ, ভীতিকর বিপদাপদ, মুছীবত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শংকা, বিরাণকারী ও দুঃখবাহী সমীরণ, বিপদ আনয়নকারী ইত্যাদি অভিধায় তাকে অভিহিত করা হয়। আবার কখনো সভা-সমিতি, বৈঠক-সমাবেশের সৌন্দর্য, বিনোদন উদ্যান, পার্ক, ক্লাব, গৃহ-কুটিরের শোভাবর্ধক, আকর্ষণ সৃষ্টিকারী সামগ্রী, ব্যবসায়ে চমক সৃষ্টিকারী যন্ত্র, নৃত্যানুষ্ঠান ও সঙ্গীত মঞ্চের প্রাণ এবং দর্শকদের আনন্দ দানের বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত উভয় অবস্থায় নারীরা যুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়, তাদের কল্যাণ লাভের সকল রাস্তা হয় রুদ্ধ, আর তাদের ব্যবহার করা হয় ভুল স্থানে। তবে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় তাদেরকে অসৌজন্যমূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আর শেষোক্ত অবস্থায় মিষ্টি কথা, মধুরবানী, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ছদ্মাবরণে তাদেরকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জার্মান লেখক Hedwing Dhom বলেন, 'নারীদের ইতিহাস হচ্ছে অধিকার হরণ, আশাভঙ্গ এবং তাদের প্রতি অবিচারের বা ইনছাফহীনতার ইতিহাস। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পুরুষরা তাদেরকে দখল করে আছে'।

ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে ও পরতে পরতে সর্বজন স্বীকৃত হয়ে আছে যে, ইসলামই একমাত্র বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা যা নারীদের জন্মগত অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে যথাস্থানে সমাসীন করেছে। স্ত্রী, বোন ও মায়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্মান-ইয্যত ও মর্যাদা দিয়েছে, করেছে স্নেহ-ভালবাসা ও মায়া-মমতার অধিকারী। ঘর-গৃহস্তালীর দায়িত্ব তার কাধে অর্পণ করে তার আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত ও দৃঢ় করেছে, সন্তান প্রতিপালন, তাদের শিক্ষা দান ও দেখাশুনার দায়িত্ব তাদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে, যাতে তাদের অমর কীর্তি কলঙ্কযুক্ত না হয় এবং তাদের শারীরিক কোমলতা, কমনীয়তা ও দুর্বলতা যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কৌতুক ও হাঁসির খোরাক বা উপকরণ না হয়। অন্ততপক্ষে তাদের সম্মান-আভিজাত্য, নিষ্কলূষতা ও নিরাপত্তা যেন হিংসুক ও কু-দৃষ্টি নিক্ষেপকারীদের হিংস্র দৃষ্টিবানে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা শত ছিন্ন বস্ত্রে পরিণত না হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে ইউরোপের উন্নত দেশ ও সেখানকার চিন্তাবিদদের কেবল বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণেই ইসলামের সর্বাঙ্গীন ন্যায়সিদ্ধ, মঙ্গলজনক ও সর্বজনগ্রাহ্য জীবন ব্যবস্থাকে শুধু প্রতিহতই করা হয়নি বরং এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রপাগাণ্ডা শুরু করেছে। সেই সাথে ইসলামে নারী অধিকারকে খর্ব করার যুক্তিহীন দাবীও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাকে স্বৈরাচারী, সেকেলে ও মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে গণ্য করা হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে, তাতে জ্ঞান ও বিবেক বর্জিতভাবে কেবল আবেগতাড়িত হয়ে শোরগোল ও চিৎকার-চেঁচামেচি করা হয়েছে। ঐ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম কঠোর মনোভাবাপন্ন ফ্রান্সের নারী আইন বিশেষজ্ঞ Christine de pigan-এর কিছু রচনা ও লেখনী ছিল যাতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় চিন্তাশীল, যথার্থ ও সুবিবেচনা প্রসূত এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা হয়। তার লেখায় সমগ্র দেশ ও রাষ্ট্রে এক চমক সৃষ্টি হয়। আর ঐ লেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল নারীদেরকে পুরুষদের সমমর্যাদায় সমাসীন বা সমান সমান হিসাবে দণ্ডায়মান করা। তন্মধ্যে বৃটেনের Bathsua Makin (1608-1675), Mary Astell (1666-1731), Mary lee lady chudlieh, Maria De Zayas, জার্মানীর Helen, Mary Wollstone Craft (1759-1777), ফ্রান্সের Etta palm D Aelderes (1827-1891) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের এ আন্দোলন থেকেই নারী স্বাধীনতার ধারণা মিসরে প্রবেশ করে। আর কাসিম আমীন ও তার শিষ্য হাদী শা'রাবী তার বড় পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী ও পতাকাবাহী হিসাবে সম্মুখে আসে। তিউনিশিয়ায় তাহির হাদ্দাদ ও বুরক্বিবাহ উক্ত কাজ পূর্ণতা দান করে।

নারী আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে বিশাল শান-শওকত, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে ধূমধামে শুরু হয় তন্মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমান অধিকার। আর এ উদ্দেশ্যের ভিত্তি হ'ল তাদের ধারণামতে নারী-পুরুষ একই ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্যের

* প্রফেসর, ইমাম ইবনু তাযমিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়, চন্দনপাড়া, নেপাল।

অধিকারী, তাদের মাঝে ব্যবধান নেই, কোন পার্থক্য নেই। পুরুষরা স্রেফ তাদের উচ্চতম সম্মান মর্যাদা বজায় রাখার জন্য নারীদের দুর্বলতার প্রতারণা ও ধোঁকা সৃষ্টি করে চলছে। ফলে ফ্রান্সের লেখক Marie De Gaurnay (1516-1645) তাঁর The equality of men and women শীর্ষক প্রবন্ধে জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের সমান শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতা বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে Mary Astell (1666-1731) লিখেছেন যে, আল্লাহ নারী-পুরুষকে মেধার দিক দিয়ে একই সমান চিন্তা-গবেষণার অধিকারী করেছেন। ইংরেজ শিক্ষাবিদ Bathsua Palm Makin-এর চিন্তাধারা থেকে সেটা আরো শক্তিশালী ও পরিপক্ক হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থ Physiology of women-এ লিখেছেন বিস্তারিত গবেষণায় নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য প্রমাণিত হয় না। অনুরূপ দাবী ফরাসী লোনীও করেছেন। এখন আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই যে, উল্লিখিত দাবীগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কতটুকু যথার্থ এবং প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষ মেধা ও শারীরিক দিক দিয়ে উভয়ে সমান, নাকি বাস্তব অবস্থা তার বিপরীত?

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বলে যে, নারী-পুরুষের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। একথা ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী লোকমাত্রই অনুধাবনে সক্ষম হবেন। যদি উক্ত দুই জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য না-ই থাকে তাহ'লে ইউরোপ-আমেরিকায় পূর্ণ সমঅধিকারের সোচ্চার দাবী ও ধূমধাম থাকা সত্ত্বেও বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, রাশিয়া এবং অনুরূপ সমমনা কোন দেশে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর মহাপরিচালক বা কমান্ডার ইন চীপ (সর্বাধিনায়ক) পদে কখনো কোন সাহসী বীরাঙ্গনা নারীকে কেন অধিষ্ঠিত করা হয় না? সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য সেনার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের জন্য এবং সম্মুখ সমরে (Frontal attak) ও অগ্রবর্তী দলে কোন কালে কোন শক্তিশালী নারীকে কেন কাজে লাগানো হয় না, যদিও আমেরিকা ও তাঁর সমমনা দেশে মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়? এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য অদ্যাবধি কেন কোন নারীর হয়নি? পুরুষরা যত নোবেল পুরষ্কার লাভ করেছে তার দশ ভাগের একভাগও নারীরা অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিমা দেশের দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে, এটা নারীদের জন্য সামান্য হ'লেও বন্ধ্যত্ব। ইউরোপীয় দেশে এরূপ কোন রেকর্ড নেই, যদিও সেখানে পূর্ণ নারী স্বাধীনতা রয়েছে। এই পশ্চাদপদ অবস্থা তাদের জাতিগত দুর্বলতা বৈ কি? এখানে নারীদের শারীরিক, চারিত্রিক, সৃষ্টিগত, স্বভাবগত, মেধাভিত্তিক কিছু পার্থক্য আমরা আলোচনা করব।

শারীরিক ও সৃষ্টিগত পার্থক্যঃ

পুরুষ-মহিলা যেকোন দেশ বা যত বড় ভূখণ্ডের হোক না কেন উভয়ের শরীরে কিছু প্রকাশ্য ও বাহ্যিক পার্থক্য দৃশ্যমান। যেমন-

(১) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পুরুষের মুখমণ্ডলে লোম তথা দাড়ি, গোফ বের হয়। কিন্তু মেয়েদের মুখমণ্ডলে এরূপ কিছু বের হয় না বা এরূপ কিছু প্রকাশ পায় না।

(২) মেয়েদের শরীর নরম, মোলায়েম, কোমল ও হাল্কা হয়, অথচ পুরুষের শরীর হয় মযবূত, শক্ত ও শক্ত পেশী বিশিষ্ট।

(৩) মেয়েদের শক্তি-সামর্থ্য পুরুষের চেয়ে কম হয়। কঠিন-কঠোর, পরিশ্রমলব্ধ ও কষ্টকর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তারা করতে পারে না। সাথে সাথে তাদের শারীরিক ওযন ও উচ্চতাও পুরুষের চেয়ে কম হয়। আর এই পার্থক্যগুলি শৈশবকাল থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। ডাঃ হামিদ আব্দুস সালাম যাহরান স্বীয় علم نفس النمو (ইলমু নাফসিন নুমূ) গ্রন্থে বলেন, يظل الذكور أكبر حجمًا وأثقل وزنا وأطول قامة من الإناث وتظهرالأسنان عند الإناث مبكرة بينها عند الذكور، 'মেয়েদের তুলনায় পুরুষের শরীর অধিক ভারী, এমনকি উচ্চতা ও গঠন দীর্ঘ হয়। মেয়েদের দাঁত ছেলেদের পূর্বেই বের হয়'।

চিত্রকর ওছমান উক্ত ধারণা ও চিন্তাধারাকে সত্যায়ন করে লিখেছেন যে, এক বছর বয়সের ছেলে শিশু মেয়ে শিশুর তুলনায় ১ কেজি বেশী ভারী এবং এক থেকে দুই সেন্টিমিটার লম্বা হয়। প্রফেসর আইচনিক এটাও বলেছেন যে, 'কোন মেয়ে শিশু যখনই স্বীয় মায়ের রেহেমে বা গর্ভাশয়ে আসে তখন ছেলে শিশুর তুলনায় প্রশস্ত নিম্নাংগের অধিকারী হয়। নিম্নাংগ যতই প্রশস্ত হবে জরায়ু ততই বড় হবে'। উনবিংশ শতাব্দীর জনৈক ইনসাইক্লোপেডিয়া লেখক عورت (আওরাত) শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'পুরুষ-নারীদের সন্তান জন্মদানকারী অঙ্গের গঠন ও আকৃতিতে যদিও বড় ধরনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এটাই একমাত্র পার্থক্য নয়, বরং মেয়েদের আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে ভিন্নতর। এমনকি কোন কোন অঙ্গ যদিও বাহ্যত পুরুষের অঙ্গের সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয় (তাও পুরুষের চেয়ে ভিন্ন)।

(৪) মানব জীবনের মূলকেন্দ্র হৃৎপিণ্ডের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের হৃদপিণ্ড পুরুষের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে ৬০ ড্রাম ছোট ও পাতলা হয়ে থাকে।

(৫) শাস-প্রশ্বাসের দ্রুততার ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কার্বনিক এসিডের যে পরমাণু বের হয়, তা অভ্যন্তরীণ তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে নিঃশ্বাসের সাথে মিশে বাইরে বের হয়ে আসে। উক্ত গবেষণার ভিত্তিতে জানা যায় যে, পুরুষ এক ঘন্টায় প্রায়

১১ ড্রাম পরিমাণ কার্বন দগ্ধিভূত করতে পারে কিন্তু সেখানে নারী পারে ৬ ড্রামের কিছু বেশী।

(৬) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আমুণ্ডা ও ফিরিসরিট নারী পুরুষ উভয় প্রকার দেহের পরিমাণগত দিক থেকে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন যে, উভয় প্রকার দেহে কিছু গ্রন্থি (Glands) রয়েছে, যেখান থেকে হরমোন (Harmone) প্রকাশিত হয়। পুরুষের শরীরে এস্ট্রোজেন নামক হরমোন এবং নারীদের দেহে এনড্রোজেন নামক হরমোন পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার হরমোনের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান।

(৭) জন্মগতভাবে মহিলাদের পেটে এমন একটি থলি রয়েছে যাতে শুক্রের ফোটা জমা হয়ে শিশুর আকৃতি তৈরী হয়, সেটাকে সাধারণভাবে আমরা রেহেম বা জরায়ু বলে থাকি। পুরুষের মাঝে উক্ত থলি নেই।

(৮) প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর প্রত্যেক মাসের কিছু নির্দিষ্ট দিনে নারীদের রক্ত নির্গত হয়। এসময় তারা মেধাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রুটির শিকার হয়। তাদের মধ্যে রাগচটাভাব ও খিটখিটে স্বভাব সৃষ্টি হয়। ফলে এ সময় তাদের দ্বারা চিন্তাশীল ও বিবেচ্য কাজের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। যে কারণে তাদের দুর্বল ও অক্ষম অবস্থা প্রকাশিত হয় বা প্রাধান্য পায়। কিন্তু পুরুষদের বেলায় এরূপ ঘটে না।

(৯) পুরুষের তুলনায় নারীদের উঠতি বয়স বা যৌবনের সূচনা হয় তীব্রতর ও শক্তিশালী এবং মধ্যবয়স হয় অতি সংক্ষিপ্ত।

প্রকৃতিগত পার্থক্যঃ

প্রকৃতি বা স্বভাবগত দিক দিয়ে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় সাহসী চরিত্রের ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেশী পসন্দ করে। এ বিষয়টি ঐ সময় থেকে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে যখন তার মধ্যে পরিবেশের প্রভাব পড়ার কোন সন্দেহ করা যায় না। প্রফেসর ইস্টিউন গোল্ডবারগ বলেন, 'নারীরা দ্রুত প্রভাবিত হয়। সুখ-দুঃখের খবর দ্রুত তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। আবার কোন ভীতিকর জিনিসকে দেখে অতি দ্রুত তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে এসব প্রতিক্রিয়া বিলম্বে হয়। মেয়েরা দ্রুত কথা বলতে শেখে কিন্তু বিশুদ্ধ উচ্চারণে তারা দেরী করে। বাঘ-হাতির পরিবর্তে পুতুল নিয়ে খেলা করা মেয়েদের নিকট অতি পসন্দের। আর যদি মাটির খেলাঘর তৈরী করে খেলে তাহ'লে ছেলেদের বিপরীত তারা ঘরের অভ্যন্তরীণ অংশের পরিপাটি ও সাজসজ্জা করতে চায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্যঃ

সম্প্রতি মানুষের মস্তিষ্কের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে এবং নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে, রহস্য উদঘাটিত হচ্ছে। ঐ বিষয়ে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ দলের একটি জরিপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণায় ব্রেন স্ক্যানিং-এর এক অভিনভ কৌশল (FMRI) ব্যবহার করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা অবগত হওয়া যে, যখন মানুষকে কিছু বলা হয় কিংবা কিছু পড়ে শুনানো হয় তখন তার মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় কম্পন কিরূপ হয়। ঐ গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, পুরুষরা কেবল মস্তিষ্কের এক দিক দিয়ে শ্রবণ করে। অথচ মহিলারা মস্তিষ্কের উভয় দিক ব্যবহার করে থাকে। এই গবেষণায় ১০ জন সুস্থ পুরুষ ও ১০ জন সুস্থ নারীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়, যাতে জানা যায় যে, নর-নারীর মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকৃতপক্ষে সমান নয়।

৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে লন্ডনের Sunday times পত্রিকায় আরেকটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়েছে পুরুষের মস্তিষ্ক মেয়েদের তুলনায় ৪ গুণ বেশী শক্তিশালী। গবেষণা অনুযায়ী পুরুষের মস্তিষ্কের বার্তা প্রেরণকারী কোষের (Cell) প্রবাহ বা চলৎশক্তি মেয়েদের মস্তিষ্কের কোষের তুলনায় ৪গুণ বেশী। টরেন্টো ইউনিভারসিটির প্রফেসর এডওয়ার্ড এবং প্রফেসর এন্ডার ইউজানিস তাদের গবেষণার আলোকে বলেন যে, আমরা ১৮২ জন ছাত্র এবং ২০১ জন ছাত্রীর উপর পরিচালিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে উভয়ের মস্তিষ্কের কোষের প্রবাহ ও চলৎশক্তিতে পার্থক্য পেয়েছি। এর ভিত্তিতে তারা বলেন, পুরুষের মস্তিষ্কের কোষে সংরক্ষণ ও ধারণকারী স্তর মেয়েদের কোষের চেয়ে অধিক মোটা ও পুরু। যে কারণে এসব কোষ মহিলাদের কোষের তুলনায় অতি দ্রুত বার্তা প্রেরণ করতে পারে। বিখ্যাত ফেলিষ্ট দার্শনিক প্রোডান স্বীয় ابتكار النظام (ইবতেকারুন নিযাম) গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'মেয়েদের মেধা পুরুষের মেধার তুলনায় ঐরূপ দুর্বল যেমন তাদের জ্ঞান পুরুষের জ্ঞানের তুলনায় কম ও স্বল্প পরিলক্ষিত হয়'। এরই উপর ভিত্তি করে মনোবিশেষজ্ঞ ডাঃ বানুরমাকুবী বলেন, পুরুষের মধ্যে আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল শক্তি এবং নতুনত্ব আনয়নের ক্ষমতা ও যোগ্যতা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। আর এটা তার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত।

শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী স্বীয় الانسان (আল-ইনসান) গ্রন্থে লিখেছেন,

وفى الجزء الأول من بحثها درست الإحصاءات وسجلت الاختلافات العقلية بين الجنسن خلال الأربعين سنة الأخيرة، ودلتها دراستها على أن الرجال أكثر انتاجًا وابتكارًا من النساء فى المجالات الأدبية–

'আমি উহার গবেষণার প্রথমাংশে গণিত শিক্ষা লাভ করেছি এবং উভয় জাতির মধ্যকার জ্ঞানগত পার্থক্য নোট করেছি

৪০ বছর যাবৎ। এই অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি ও নতুনত্ব সৃষ্টিতে পুরুষ (মহিলাদের চেয়ে) অধিকতর যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী'। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এমন ছাত্রী খুব কম আছে যারা জ্ঞানগত সমস্যায় ধৈর্যধারণ করে সমস্যার সমাধান করতে এবং নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালায়।

মেয়েদের মেধাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতার সবচেয়ে বড় ও বিশ্বস্ত প্রমাণ হচ্ছে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী বলেছেন। তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتَ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرِّجَالِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ– 'বুদ্ধিমত্তা ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ তোমাদের মত কাউকে আমি দেখিনি, যারা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি হরণে অধিক পারঙ্গম' *(মুত্তাফাক আলাইহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

এই মৌলিক কারণেই আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপরে পুরুষদেরকে নেতৃত্ব দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপরে অন্যকে মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে' *(নিসা ৩৪)*।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন নারীকে নবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়নি এবং তাকে ইমামতি ও দলপতি, দলনেতার যোগ্যতা সম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয় না। ইমাম বগভী شرح السنة (শারহুস সুন্নাহ) গ্রন্থে লিখেছেন اتفقوا على أن المرأة لاتصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا، 'সকল বিদ্বান এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, মহিলাদেরকে ইমাম (নেতা) ও কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করা সমীচীন নয়'। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতূবী লিখেছেন, واجمعوا على أن المرأة لايجوز أن تكون إمامًا، 'মহিলাদের ইমাম হওয়া সকলের ঐক্যমতে অবৈধ'।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং মানুষকে তার যথাযোগ্য স্থান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

*নূরুল ইসলাম**

শিক্ষার প্রতি ইসলাম ধর্মে যত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, অন্য কোন ধর্মে তা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি হেরা গুহায় প্রথম যে অহী অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত *(আলাক্ব ১-৫)*। এখেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। আল্লাহ চাইলে প্রথম অহী ইসলামের অন্য যেকোন বিষয়ে অবতীর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার নিমিত্তে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম অহী অবতীর্ণ করেছেন।

জাহেলী সমাজে মহিলাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার ছিল না। The New Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে- "Woman's status had degenerated to that of child bearing slaves. Wives were secluded in their homes, had no education and few rights, and were considered by their husbands on better than chattel". 'সে সমাজে নারীদের স্থান এত অধঃপতিত ছিল যে, তাদের সন্তানরা তাদেরকে দাসে পরিণত করত। নারীরা নিজ গৃহেই ছিল নির্বাসিত। স্ত্রীদের শিক্ষার বা অন্য বিষয়ের সামান্যতম অধিকারও ছিল না। তাদের স্বামী কর্তৃক তারা অস্থাবর সম্পত্তি বৈ কিছুই গণ্য হ'ত না'।[১] সে যুগে প্রবাদ ছিল- Woman are the whips of Satan. 'নারী হ'ল শয়তানের চাবুক'। Trust neither a king, a horse nor a woman. 'রাজা, ঘোড়া বা নারী কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না'।

ইসলাম নারীকে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, "With the advent of Islam, circumstances improved for the woman. The woman's dignity and humanity were restored. Islam confirmed her capacity to carry out Allah's commands, her responsibilities and observation of the commands that lead to heaven. Islam considered the woman as a worthy human being, with a share in humanity equal to that of the man. Both are two branches of a single tree and two children from the same father Adam and mother Eve. Their single origin, their general human traits, their responsibility for the observation of religious duties with the consequent reward or punishment, and the unity of their destiny all bear witness to their equality from the Islamic point of view".

** এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *The New Encyclopaedia Britannica (USA: 1995), Vol. 19, P. 909.*

‘ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের পরিস্থিতির উন্নতি হয়। নারীর সম্মান এবং মানবতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ, তার দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের ক্ষেত্রে- যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়, নারীর যোগ্যতাকে ইসলাম পুনঃনিশ্চিত করে। ইসলাম নারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ মনে করে এবং মানবিকতায় তার অংশ পুরুষের মত সমান মনে করে। তারা দু’জন একই বৃক্ষের দু’টি শাখা এবং একই পিতা আদম ও মাতা হাওয়ার দুই সন্তান। তারা একই উৎস, তাদের একই ধরনের মানবিক গুণাবলী, ইসলামী বিধানাবলী পালনে তাদের একই ধরনের দায়িত্ব। যার ফলস্বরূপ পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে। তাদের একই পরিণতি ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সমতা প্রমাণ করে’।[২]

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের আদেশ দিয়ে বলেছে, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয’। =(*ইবনু মাজাহ হা/২২৩, সনদ ছহীহ*)। এ হাদীছে মুসলমান বলতে নারী-পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ’ (*ফাত্বির ২৮*)। এখানে নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। কারণ জ্ঞান হচ্ছে সেই আলো, যার সংস্পর্শে আসা মাত্রই মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হ’তে শুরু করে এবং মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। দার্শনিক সক্রেটিস তাইতো বলেছেন, "From Knowledge come virtue and goodness; from ignorance comes all that is evil. No man willingly chooses what is evil; he does evil out of ignorance." ‘জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পুণ্য এবং কল্যাণ; অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোন ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় যা কিছু খারাপ তা পসন্দ করে না; সে পাপ করে অজ্ঞতার কারণে’।

শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজ উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চাসনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ’তে পারে না। নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বয়েই সমাজ। কোন জাতি বা ধর্ম সমাজের শুধু নারী বা পুরুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলে কখনো সফলকাম হ’তে পারে না। সেকারণ ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জনের পথকে সুগম করেছে। যাতে মুসলিম সমাজ সবদিক থেকে অন্যদের জন্য মডেল হ’তে পারে, উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারে কেউ তার সমকক্ষ না হ’তে পারে।

২. *শাহ আবদুল হান্নান, নারী ও বাস্তবতা (ঢাকাঃ এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২), পৃঃ ১৬-১৭।*

এতদসত্ত্বেও একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী নিজেদের চোখে পক্ষপাতিত্ব, গোঁড়ামী, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও শত্রুতার রঙ্গীন চশমা পরে ইসলামের পূত-পবিত্র অবয়বে কলংকের কালিমা লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে বলে যে, ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদেরকে শিক্ষার অধিকার দেয়নি... ইত্যাদি। তাদের এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপবাদ থেকে ইসলাম সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক। ইসলাম কখনোই এ ধরনের চিন্তা-চেতনা পোষণ করে না। প্রখ্যাত সিরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, ‘আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী’ (ইসলামী শরী‘আতে সুন্নাহর স্থান) শীর্ষক অমূল্য গবেষণা গ্রন্থের লেখক ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ (১৯১৫-১৯৬৪) যথার্থই বলেছেন, ‘কুরআন ও হাদীছের কোথাও একটি উক্তিও এমন নেই, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে বা নিরুৎসাহিত করে’।[৩]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন যে,

قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ–

‘একদিন মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, পুরুষেরা আমাদের উপরে জয়লাভ করে যাচ্ছে (অর্থাৎ আপনার হাদীছ সব পুরুষেরা শিখে নিচ্ছে)। আপনি আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা করেন। সেদিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন’।[৪]

নারীরা যাতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য ঈদের মাঠে তিনি পুরুষদের সামনে বক্তব্য পেশ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ

৩. *ড. মুসতাফা আস-সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪), পৃঃ ১০৯।*

৪. *বুখারী হা/১০১ ‘ইলম’ অধ্যায় ‘মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোন একদিন ধার্য করা যাবে কি-না’ অনুচ্ছেদ।*

وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِى فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ–

'নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, তারপর প্রথমে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। খুৎবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হ'লেন। এরপর বেলালের হাতের ওপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বেলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন, আর মহিলারা তাতে দানসামগ্রী ফেলতে লাগলেন'।[৫]

নারীদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবসময় উৎসাহ দিতেন। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষিত করার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ–

'তিন প্রকার লোকের জন্য দু'টি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে। ১. আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবী ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে ২. ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ ও তাঁর মনিবের হক্ব আদায় করেছে এবং ৩. ঐ ব্যক্তি যার অধীনে একজন ক্রীতদাসী রয়েছে, সে তাকে সুন্দরভাবে সৎ-গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দু'টি করে পুরস্কার রয়েছে'।[৬]

নারী শিক্ষার প্রতি এরূপ গুরুত্ব আরোপের ফলে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও অসংখ্য মহিলা ছাহাবী তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, ফারায়েয, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তারা তাদের ইলমী যোগ্যতার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নারীদেরকে যতটা দুর্বল মনে করা হয় আসলে তারা ততটা দুর্বল নয়। ঐ সকল বিদূষী মহিলা ছাহাবীগণের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর নাম অগ্রগণ্য। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সুদৃঢ় পদচারণা ছিল। তাবেঈ বিদ্বান আতা (রহঃ) বলেন, كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم، وأحسن الناس رأيا فى العامة– 'আয়েশা (রাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফক্বীহ, অধিক জ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর-সঠিক মতামতের অধিকারিণী'।[৭]

উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولابفريضة ولا بحلال وحرام، ولابشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضى الله عنها– 'আমি কুরআন, ফরয, হালাল-হারাম, কবিতা, আরবের ইতিহাস ও কুলজী বিদ্যায় আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি'।[৮]

হাফেয যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) বলেন, أفقه نساء الأمة على الإطلاق. 'সাধারণভাবে উম্মতের সকল মহিলার চেয়ে তিনি বিজ্ঞ ফক্বীহ' ছিলেন'।[৯]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অপরিসীম দখল ছিল। ২২১০টি হাদীছ তিনি মুখস্থ করেছিলেন।[১০] আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا– 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের উপরে কোন হাদীছের ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য ঠেকলে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তার ইলমী সমাধান নিয়ে আসতাম'।[১১]

তাবেঈ বিদ্বান মাসরূক বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ. 'আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বড় বড় ছাহাবীগণকে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ফারায়েয বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি'।[১২]

---

৫. *বুখারী হা/৯৭৮ 'ঈদায়েন' অধ্যায়, 'ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নছীহত' অনুচ্ছেদ।*

৬. *বুখারী হা/৯৭ 'ইলম' অধ্যায়, 'নিজের দাসী ও পরিবার-পরিজনকে শিক্ষাদান করা' অনুচ্ছেদ।*

৭. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫, ২০০।*

৮. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৩৭৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮ আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আছফিয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৮৮), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০।*

৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৩৫।*

১০. *তদেব ২/১৩৯।*

১১. *তিরমিযী হা/২৯৮২ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬১৯৪ 'মানাকিব' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*

১২. *সিয়ারু আ'লামিল নুবালা ২/১৮২।*

ফারায়েযের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুবিদিত। উরওয়া বিন যুবাইর বলেন,

ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضى الله عنها. فقلت لها: يا خالة، الطب، من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لى الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم بعضا، فأحفظه–

'আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিক পণ্ডিত কাউকে দেখিনি। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনি চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে শিখলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি অসুস্থ হ'লে আমাকে চিকিৎসা দেয়া হ'ত এবং কেউ অসুস্থ হ'লে তাকেও চিকিৎসা দেয়া হ'ত। আর আমি মানুষদের একে অপরকে চিকিৎসা দিতে দেখে (ঔষধপত্রের) নাম মুখস্থ করে নিতাম (এবং এভাবেই আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছি)'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি নারীরাও জ্ঞানজগতের মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণের সামান্যতম সুযোগও নষ্ট করতেন না। সর্বাবস্থায় তারা জ্ঞানার্জনের জন্য উদগ্রীব থাকতেন। একদিন খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা হজ্জ আদায় করছিলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও হজ্জের রুকনসমূহ পালনে ব্যস্ত ছিলেন। ইত্যবসরে মহিলাটি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, পার'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে নারীদেরকে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং অনাগত ভবিষ্যতে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে অবারিত করার জন্য শারঈ পর্দা বজায় রেখে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আর খুৎবা ও জামা'আত, দুই ঈদের ছালাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে মহিলারা তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে। হিশাম বিনতে হারেছা (রাঃ) বলেন,

وَمَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ. إِذَا خَطَبَ النَّاسَ–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ থেকে সূরা ক্বাফ শ্রবণ করে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুৎবায় সূরাটি পড়তেন'।[১৫]

নারীদের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَيَمْنَعْهَا 'তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তাহ'লে সে যেন তাকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে'।[১৬] দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে মসজিদের সাথে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্ক ঠুনকো হয়ে গেছে। যার ফলে হাট-বাজার, শপিং কমপ্লেক্স ও সিনেমা হ'লে বেপর্দা ঘুরে বেড়াতে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে না; অথচ আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে আসতে তাদেরকে ভয় পেয়ে বসে। প্রচলিত এ ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মসজিদের সাথে মুসলিম রমণীদের সম্পর্কের নিবিড় সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। তাতে ইহকাল ও পরকাল হবে কল্যাণকর।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মহিলা ছাহাবীগণ ছাড়াও ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক বিদূষী মুসলিম মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাতি হুসাইন (রাঃ)-এর মেয়ে সুকায়না তাফসীর ও হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। মিসরীয় কবি আহমাদ শাওকী এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

كَانَتْ سُكَيْنَةُ تَمْلَأُ الدُّنْيَا : وَتَهْزَأُ بِالرُّوَاةِ
رَوَتِ الْحَدِيْثَ، وَفَسَّرَتْ : آيَ الْكِتَابِ الْبَيِّنَاتِ–

'সুকায়না তাঁর জ্ঞানের দ্বারা দুনিয়াকে ভরে দিয়েছিলেন এবং বর্ণনাকারীদেরকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন'।[১৭] কাব্য সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল। কবিরা তাঁর কাছে এসে কবিতা আবৃত্তি করত। তিনি

১৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৮৩।*
১৪. *বুখারী হা/১৫১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'হজ্জ ফরয ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *মুসলিম হা/৮৭২ 'জুম'আহ' অধ্যায়।*
১৬. *বুখারী হা/৮৭৩ 'আযান' অধ্যায় 'মসজিদে আসার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ।*
১৭. *আহমাদ শাওকী, আশ-শাওকিয়্যাত (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩।*

তাদের কবিতার সমালোচনা করতেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করতেন। ডঃ শাওকী যায়ফ বলেন, "They would recite their poems to her, and she often criticised or commended their poetry, and often referred their disputes and claims to excellence".[১৮].

নারী শিক্ষার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর গুরুত্বারোপ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মহিলাদের বিচরণ ও অবদানের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে কবি আহমাদ শাওকী বলেন,

هَذَا رَسُوْلُ اللهِ لَمْ : يُنَقِّصْ حُقُوْقَ الْمُؤْمِنَاتِ

اَلْعِلْمُ كَانَ شَرِيْعَةً : لِنِسَائِهِ الْمُتَفَقِّهَاتِ

رُضْنَ التِّجَارَةَ وَالسِّيَا : سَةَ وَالشُّئُوْنَ الْأُخْرَيَاتِ

وَلَقَدْ عَلَتْ بِبَنَاتِهِ : لُجَجُ الْعُلُوْمِ الزَّاخِرَاتِ

'তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ), মুমিন নারীদের অধিকার তিনি খর্ব করেননি। বিদূষী মুসলিম নারীদের ছিল শরী'আত বিষয়ক জ্ঞান। ব্যবসা, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছিল তাদের পদচারণা। তৎকালীন কন্যাদের দ্বারা জ্ঞানসমুদ্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল'। এরপর মুসলিম নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,

وَحَضَارَةُ الْإِسْلَامِ تَنْ : طِقُ عَنْ مَكَانِ الْمُسْلِمَاتِ

بَغْدَادُ دَارُ الْعَالِمَا : تِ، وَمَنْزِلُ الْمُتَأَدِّبَاتِ

وَدِمَشْقُ تَحْتَ أُمَيَّةٍ : أُمُّ الْجَوَا رِى النَّابِغَاتِ

وَرِيَاضُ أَنْدَلُسٍ نَمَيْ : نَ الْهَاتِفَاتِ الشَّاعِرَاتِ–

'ইসলামী সভ্যতা মুসলিম মহিলাদের মর্যাদার সাক্ষ্য দেয়। মুসলিম শাসনামলে বাগদাদ ছিল বিদূষী ও সাহিত্যিক মহিলাদের প্রাণকেন্দ্র। আর উমাইয়া শাসনের সময় দামেশক ছিল প্রতিভাবান মহিলাদের সূতিকাগর এবং স্পেনের বাগিচা খ্যাতিমান মহিলা কবিদের প্রতিভা বিকাশ করেছিল'।[১৯]

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম জাতির উন্নত-অগ্রগতি নির্ভর করছে শিক্ষিতা নারীর উপর। 'নীল নদের কবি' (شاعر النيل) হাফেয ইবরাহীম বলেছেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا : أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

اَلْأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الْحَيَا : بِالرِّىِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيْرَاقِ

اَلْأُمُّ أُسْتَاذُ الْأَسَاتِذَةِ الْأُلَى : شَغَلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الْآفَاقِ–

'মা হচ্ছেন পাঠশালা সদৃশ। যদি তুমি তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোল, তাহ'লে তুমি সুদৃঢ় অবকাঠামোর উপর ভিত্তিশীল একটি আদর্শ জাতি গঠন করতে পারবে। মা হচ্ছেন একটি বাগান সদৃশ। পানি দ্বারা সেচ দিয়ে যদি উহার উপযুক্ত পরিচর্যা করা যায়, তাহ'লে তা পত্র-পল্লবে সুশোভিত হবে। মা হচ্ছেন ঐ সকল শিক্ষকদের শিক্ষক যাদের অবদান বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত'।[২০]

অনুরূপভাবে কবি আব্দুর রহমান কাশগরী (১৯১২-১৯৭১) বলেন,

وَلَمْ أَرَ لِلْخَلَائِقِ مِنْ مَحَلٍّ : يُهَذِّبُهَا كَحِضْنِ الْأُمَّهَاتِ

فَحِضْنُ الْأُمِّ مَدْرَسَةٌ تَسَامَتْ : بِتَرْبِيَةِ الْبَنِيْنَ وَ الْبَنَاتِ–

'চরিত্র গঠনের জন্য মায়ের কোলের ন্যায় আমি এমন কোন উপযুক্ত স্থান দেখিনি, যা উহাকে (চরিত্র) মার্জিত-পরিশীলিত করতে পারে। মূলতঃ মাতৃক্রোড় এমন এক পাঠশালা, যা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা সমুন্নত হয়'।

শিক্ষিতা নারী তথা মা ছাড়া শিক্ষিত জাতি গড়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়াই স্বাভাবিক। 'কবি সম্রাট' (أميرالشعراء) আহমাদ শাওকী যথার্থই বলেছেন,

وَإِذَا النِّسَاءُ نَشَأْنَ فِيْ أُمِّيَّةٍ : رَضَعَ الرِّجَالُ جَهَالَةً وَخُمُوْلاً

'মহিলারা যদি অজ্ঞতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহ'লে তাদের সন্তানেরা শোষণ করে মূর্খতা ও দুর্বলতাকে'।[২১] তাই মুসলিম পুনর্জাগরণের জন্য শিক্ষিতা নারীর আজ বড়ই প্রয়োজন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাইতো বলেছিলেন, "Give me a good mother. I shall give you a good nation." 'আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব'।

১৮. *Dr. Shawqi Dayf. The Universality of Islam, Trans. by: Dr. Abdelwahab El- Affendi (ISESCO: 1998), P. 110.*

১৯. *আশ-শাওকিয়্যাত ১/১০৩-১০৪*।

২০. *দীওয়ানু হাফেয ইবরাহীম (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়াহ, ১৯৪৮), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০*।

২১. *আশ-শাওকিয়্যাত ১/১৮৩*।

Contents

ইসলামী জ্ঞান প্রয়োজন কেন?

*জহুর বিন ওছমান**

মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْن بالبينات وَالزُّبُرِ–

'তোমরা যারা জান না, তারা জ্ঞানীদের নিকট হ'তে জেনে নাও স্পষ্ট দলীল সহকারে' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। উক্ত আয়াতে 'আহলে যিকির' বলতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া 'যিকির' তথা কেবল আল্লাহ্র অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যারা ফায়সাল প্রদান করেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে' *(হিজর ৯)*। সেই সাথে কেবল তাঁদের নিকট থেকে সঠিক মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিয়ে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী হ'লে দলীল সহ জানতে হবে। উক্ত দলীলের মধ্যে যেন অস্পষ্টতা না থাকে স্পষ্ট দলীল হ'তে হবে। কিন্তু বর্তমান ফেৎনার যুগে লক্ষ লক্ষ আলিম, পীর-ফকীর ও ফৎওয়াবাজদের পাল্লায় পড়ে কোটি কোটি মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষকে দ্বীনী বিষয় জানতে কোন না কোন জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হ'তে হয়। আর ঐ আলেম যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী তথা হক্বপন্থী না হন তাহ'লে তার মনগড়া সিদ্ধান্ত মেনে নিলে মুসলিম জীবন ধ্বংস হবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ–

'হে মুমিনগণ! (তোমরা জেনে রেখ!) নিশ্চয়ই অধিকাংশ আলিম ও পীর-দরবেশরা মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র পথ হ'তে মানুষকে বিরত রাখে' *(তওবাহ ৩৪)*।

ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের গতির উপর চলবে। তাদের সাথে তোমাদের চলনগতির এমন মিল হবে যে, কোন পার্থক্য থাকবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, একি ইহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, হ্যাঁ। সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মাঝে বড় বড় পদ লাভ করে প্রভাব বিস্তার করা এবং সাধারণ জনগণের মাল-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করা। বর্তমানের ন্যায় অজ্ঞতার যুগেও ইহুদী আলেম ও পীর-দরবেশদের জনগণের মাঝে ভীষণ মর্যাদা ছিল। তাদের জন্য ঐসব হাদিয়া-তোহফা চাইতে হ'ত না, জনগণই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌঁছে দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের পর ঐ ধন-সম্পদের লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে দিয়ে জনগণকে সত্য হ'তে বিরত রাখত। আর মূর্খদের মাঝে বসে চড়া গলায় বলত, জনগণকে আমরা তো সত্যের পথেই আহ্বান করছি। অথচ এটা ছিল তাদের স্পষ্ট প্রতারণা। ক্বিয়ামতের দিন এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে যে, তাদের কোন বন্ধু বা সহায়ক থাকবে না।[১]

বিজ্ঞ পাঠক! উক্ত আয়াত ও তাফসীরের মাঝে কোথাও সাধারণ মানুষকে জনগণের মাল-সম্পদ অবৈধ ভক্ষণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি; বরং সাধারণ মানুষের সম্পদ একশ্রেণীর আলেম, পীর-দরবেশ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভক্ষণ করবে একথাই বলা হয়েছে। অতএব শুধু আলেম, পীর ও দরবেশ হ'লেই চোখ বুজে তাদের ফৎওয়া অনুযায়ী আমল করা যাবে না। বরং প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক হ'ল- প্রকৃত আলেমদেরকে অনুসন্ধান করা আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের যাচাই-বাছাই করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'আমি আপনার প্রতি যিকির অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা করে' *(নাহল ৪৪)*।

আফসোস! আমরা শুধু নামে মুসলিম, আমাদের কাজে-কর্মে মুসলিমের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দুনিয়ার জীবনে চলতে গিয়ে কতনা জ্ঞান আমরা অর্জন করছি; কিন্তু যে জ্ঞানার্জন করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেদিকে ক'জনার খেয়াল আছে? যেখানে বিশ্ব নবী (ছাঃ)-কে স্পষ্ট দলীল সহকারে ফৎওয়া প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, সেখানে আমাদের মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর আলেম, পীর, দরবেশ বিনা দলীলে ফৎওয়া দিচ্ছেন, আর সাধারণ মানুষও বিনা প্রমাণ ও বিনা দলীলেই তা মেনে নিয়ে আমল করছে। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা যে, হুজুর কিবলা, পীরে কামেল, তাদের মত ব্যক্তি কি মিথ্যা বলতে পারেন? আর আমাদের বাপ-দাদারা কি তাহ'লে ভুল পথে ছিলেন? তারা কি কুরআন হাদীছ না বুঝেই ফৎওয়া দিয়েছেন ইত্যাদি।

সম্মানিত পাঠক! আপনাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কি কুরআন-হাদীছ বুঝতেন না?

** শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১০ম খণ্ড, ৬৮৫ পৃঃ।*

(না'উযুবিল্লাহ)। তবে কেন মহান আল্লাহ স্পষ্ট দলীলসহ ফৎওয়া দিতে বললেন? আর আমাদের মুসলিম সমাজের পীর, আলেম, দরবেশদের নিকট ফৎওয়ার দলীল জিজ্ঞেস করলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন? এর কারণ কি? কারণ একটিই, তা হ'ল আমরা তাদেরকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছি। ফলে তারা যা বলে, আমরা বিনা দলীলে তা মেনে নিতে বাধ্য। এভাবেই আমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّخَذُوْآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْـنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوْآ إِلاَّلِيَعْبُدُوْآ إِلَهًا وَّاحِدًا لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُـبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম, পীর ও দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিইয়ামের পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধু একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হ'তে পবিত্র' *(তওবাহ ৩১)*।

উক্ত আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আদি বিন হাতিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে অভিযোগ করে বলল, ইহুদী ও খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও পীর-দরবেশগণকে প্রভু হিসাবে মানে না এবং তাদের ইবাদত করে না? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে শোন! তারা কি তাদের আলেম ও পীর-দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম মেনে নেয়? এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল স্বীকার করে নেয়? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটাই তাদের ইবাদত করা।[২]

বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা হালাল ও হারামের মাসআলায় আলেম, ইমাম ও পীরদের অন্ধ অনুসরণ করে। ইমাম সুদ্দী বলেন, যারা বুযুর্গ এবং মুরুব্বীদের কথা মানে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে বর্জন করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৩] যেমন আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা বাদ দিয়ে পীর, আলিম, মুরুব্বী, মসজিদের ইমাম ও মোল্লা-মুন্সীর কথামত ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। তাদের সামনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাতা খুলে দিলেও তারা তা মানতে চায় না, বুঝতে চায় না; বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদেরকে যে আমলের উপর পেয়েছি তা পরিত্যাগ করতে পারব না (না'উযুবিল্লাহ)।

২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১০ম খণ্ড, ৬৭৯ পৃঃ।*
৩. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।*

সত্য সন্ধানী পাঠক! এবার আপনারাই সত্য যাচাই করে বলুন যে, আমরা কি তাহ'লে আমাদের অতীত-বর্তমান পীর, বুযুর্গ, আলেম, দরবেশ ও ইমামদেরকে প্রভুর আসনে বসাতে বাঁকি রেখেছি? উক্ত ভ্রান্ত শিক্ষা বর্তমান সমাজের জীবিত আলেম ও মুরুব্বীরাই সাধারণ লোককে দিয়ে থাকেন। সে জন্য হক্বপন্থী খাঁটি আলেমগণ যখন তাদেরকে সঠিক বিষয়ের কথা বলেন এবং ভ্রান্ত আমল পরিত্যাগের আহ্বান জানান তখন তারা অমুসলিমদের মত জবাব দেয়। যেমন-

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآأَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَآءَنَا أَوَلَوْكَانَ أَبَآؤُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَيَهْتَدُوْنَ–

'আর তাদেরকে (অমুসলিম) যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, আমরা ঐসব কথার অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি। যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না' *(বাক্বারাহ ১৭০)*।

অন্ধ তাক্বলীদ পন্থীদের যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্র কিতাব কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করুন, তখন তারা বলে যে, আমরা তো আমাদের ইমাম ও মুরুব্বীদের পথেই রয়েছি। আয়াতটি ইহুদীদের শানে নাযিল হ'লেও বর্তমানের সাথে ভীষণ মিল রয়েছে।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে যাদেরকে মুফতী মুহাদ্দিছ বলা হয় তারা মূলতঃ ফিকহের কিতাব শিক্ষা গ্রহণ করে মুফতী হয়েছে। ফলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা, যখন তাদের ফিকহের কিতাবের বিরোধী হয় তখন তারা মিথ্যা যুক্তি তর্ক দ্বারা কুরআন-হাদীছকে খণ্ডন করে। তাদের লক্ষ্য থাকে, যে করেই হোক তাদের মাযহাবী ফিক্বহের রায়কে টিকিয়ে রাখা। এ বিষয়ে যে যত পারদর্শী সে তত বড় মুফতী, এমনকি মুফতীয়ে আযম উপাধিতেও তারা ভূষিত হন। কোন কোন আলেমের চেয়ে উক্ত মুফতী নামধারীগণ আরও বেশী জঘন্য। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে তাদের স্বার্থে মিথ্যা প্রমাণিত করতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করেন না। অতএব এ কারণেই সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একান্ত কর্তব্য। দ্বীনে হক বুঝার ও মানার পূর্ণাঙ্গ মানসিকতা নিয়ে ইলমের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকলকে। আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বলীদী গোঁড়ামী পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

মুসলিম জনগণের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ উপেক্ষা করার কারণেই মানুষ বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে অবস্থানের জন্য জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لاَتَفَرَّقُوْا. 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। ঐক্য বজায় রাখতে রাসূল (ছাঃ) উপমা দিয়ে বলেছেন, 'দলচ্যুত ভেড়াকে নেকড়ে বাঘে খায়'।[১]

মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। এ পার্থক্য নিরসনের জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌوَّ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

'কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের ফায়ছালার উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখ। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৫৯)*। আল্লাহ ও রাসূলের ফায়ছালা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা মানাই বুঝায়।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ কথাই বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ.

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না'।[২]

এত নিষেধ ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও মুসলিম জাহান শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আনীত দ্বীনকে নির্মল ও নিষ্কলুষ রাখতে বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. 'যে কেউ আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু সংযোগ করবে, যা তার মধ্যে নেই তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে'।[৩] এরূপ আরো অনেক বাণীতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে দ্বীন ইসলামে কেউ কিছু সংযোজন না করে। এতদসত্ত্বেও দ্বীন ইসলামে অনেক কথা সংযোজিত হয়েছে। দ্বীনের পরিভাষায় সেগুলি বিদ'আত হিসাবে গণ্য। সেগুলি পরিহার করতে বলা হ'লেও মানুষ তা মানছে না। কারণ অধিক সংখ্যক আলেম সেগুলির সমর্থক।

এ দেশীয় মুসলিম জনগণের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সেগুলি হচ্ছে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের রাসূল, ক্বিয়ামত দিবস ও ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ১৭ রাক'আত ফরয বলে মানা, ছালাতের আগে অযূ করা, ফরয ছালাতে ইক্বামত দেওয়া, রামাযান মাসে ছিয়াম সাধনাকে ফরয মানা, সামর্থ্যবানদের জন্য যাকাত প্রদান ও জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয স্বীকার করা ইত্যাদি।

নিষিদ্ধ কাজগুলির মধ্যে সূদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, বিয়েতে যৌতুক গ্রহণ, মিথ্যা বলা, পরের হক্ব নষ্ট করা, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, মদ ও শুকরের গোশত খাওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে সব মুসলিমের মধ্যে ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু আক্বীদা ও আমলগত পার্থক্য অগণিত। সেগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক যেমন-

অধিকাংশ মুসলিম জনগণের বিশ্বাস আল্লাহ পাক নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ কুরআন মাজীদের আলোকে এ বিশ্বাস একান্ত ভ্রান্ত। আল্লাহ পাক অবশ্যই আকারবিশিষ্ট এবং সর্বত্র বিরাজিত না হয়ে আরশে সমাসীন আছেন। তবে তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর নির্দেশক্রমেই সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন কিছু নেই। আল্লাহ পাক ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যাবতীয় কিছু সৃষ্টির পর আরশে সমাসীন হয়েছেন *(আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, হূদ ৭, ফুরক্বান ৫৯, সাজদা ৪, ক্বাফ ৩৮ ও হাদীদ ৪)*। আল্লাহ পাক নিরাকার হ'লে আরশে সমাসীন হবেন কি করে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্বন্ধে অধিকাংশ মুসলিম জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত আক্বীদা বিদ্যমান, যা দূরীভূত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র নূর হ'তে সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করেন। অথচ এ ব্যাপারে তৎকালীন মক্কার কাফিরদের আক্বীদাও সঠিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নূরে সৃজিত না হয়ে সাধারণ নিয়মে সকল মানুষের মত জন্মগ্রহণ করাতেই তাঁকে কুরাইশরা রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাদের আক্বীদায় একজন রাসূল হ'লে তাঁর শান-শওকত থাকবে অফুরন্ত এবং আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে অনেক ফেরেশতা। এ ব্যাপারে

---

* *সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।*

১. *তিরমিযী, হাকিম, মিশকাত হা/১৮৪, হাদীছ ছহীহ।*

২. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬, হাদীছ হাসান।*

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*

আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ. ‘হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ, তবে পার্থক্য হ’ল, আমার কাছে অহী আসে, যা তোমাদের কাছে আসে না’ *(কাহ্ফ ১১০)*। বস্তুতঃ তিনি নিরক্ষর হয়েও অহি-র জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ছিলেন এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে সকল মানুষের সেরা ছিলেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ’ *(আহযাব ২১)*। এত বিস্তারিত বর্ণনার পরও এদেশীয় অধিকাংশ মুসলিমের বিশ্বাস, তিনি আল্লাহ্র নূর হ’তে সৃষ্টি। এ ধরনের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে শিরক। আর আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যাবে না।

অধিকাংশ মুছল্লী ভাইবোন ছহীহ হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক ওযূ করেন না। তাঁরা মাথার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীছ মোতাবেক সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করতে হবে। ওযূ সঠিক না হ’লে ছালাত হবে না। অথচ এদিকে মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

জামা‘আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুছল্লী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েন না। অথচ মাওলানা আজিজুল হক অনূদিত ছহীহ বুখারীর ৪৪১ নং হাদীছে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার ছালাত হবে না’। ছহীহ বুখারীর ৬৯৫ নং হাদীছে এবং মিশকাত, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী অনূদিত ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং ১৫৬৫, ১৫৮৩, বঙ্গানুবাদ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড) ১২৪৭ নং হাদীছে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মৃত মুসলিম জনগণকে সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযার ছালাত পড়িয়ে দাফন করা হয়ে থাকে।

ছালাতে দাঁড়িয়ে মুছল্লার দো‘আ হিসাবে যা পঠিত হয়ে থাকে তার ছহীহ কোন দলীল নেই। দলীলবিহীন ইবাদতই বিদ‘আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সকল ইবাদতে নিয়ত করা যরূরী। নিয়ত মনের সাথে সম্পর্কিত। নিয়ত করা যরূরী বলে গতবাঁধা নিয়ত রচনা করা হয়েছে। নিয়তের সঠিক পদ্ধতি মনে মনে সংকল্প করা মাত্র। অথচ তা মৌখিক উচ্চারণে বলা হয়ে থাকে।

সম্মিলিত মুনাজাতের বিশুদ্ধ কোন দলীল নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে ৩০ হাযার ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেছেন বলে বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ক্বাস্তুলানী সহ অনেকে উল্লেখ করেছেন। অথচ এত ওয়াক্ত ছালাতের একটি ওয়াক্তেও তিনি ছালাতের পর সম্মিলিত দো‘আ করেছেন বলে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ছহীহ তো দূরের কথা যঈফ, মাওযূও নয়।[4] এই বিদ‘আতী কাজ এত অধিক সংখ্যক মানুষ কর্তৃক আন্তরিকতার সাথে পালন করা হয়, যা দেখে মনে হয় এটি ছালাতের একটি বিশেষ অংশ। মুনাজাত করা না হ’লে ছালাতই শুদ্ধ হয় না বলে অধিকাংশ মুছল্লীর ধারণা।

একাধিক ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ইক্বামতের বাক্যগুলি একবার একবার হবে। অথচ তা দু’বার দু’বার বলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

মুসলিম সমাজে মীলাদ, শবেবরাত, জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন ইত্যাদি কাজগুলি অতি আন্তরিকতার সাথে পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলির ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। দুই ঈদের ছালাতকে অধিকাংশ মুসলিম ওয়াজিব মনে করেন এবং ৬ তাকবীরে আদায় করেন। অথচ তা সুন্নাত এবং ১২ তাকবীরে আদায় করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত। ছহীহ হাদীছ উপেক্ষা করে ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করার সার্থকতা কি?

প্রত্যেক সামর্থ্যবান পরিবারের পক্ষ হ’তে সামর্থ্যের ভিত্তিতে একটি গরু কিংবা ছাগল বা ভেড়া কুরবানী করা সুন্নাত। অথচ ৭ বাড়ির ৭ জনে মিলে একটি গরু কুরবানী করা হয়ে থাকে।

একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হ’লে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা সুন্নাত। মুছাফাহার নতুন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। সেটি হচ্ছে উভয়ের দু’হাতে মুছাফাহা করার পর ডান হাতটি নিজ নিজ বুকে স্থাপন করা, এ নিয়ম পরিত্যাজ্য। তাছাড়া খাদ্যগ্রহণকারী ও ওযূকারীকে সালাম দেওয়া যাবে না বলে সমাজে প্রচলিত আছে, যা ছহীহ হাদীছ সমর্থিত নয়।

আল্লাহ পাক যিকির করার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِكُمْ.

‘তারপর তোমরা যখন ছালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় যিকির করবে’ *(নিসা ১০৩)*। আর এ যিকির করার নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ‘তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে’ *(আ‘রাফ ৫৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ–

‘আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে মনে মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা কথা দ্বারা প্রকাশ না পায়; সকালে ও সন্ধ্যায়’ *(আ‘রাফ ২০৫)*। অথচ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে সমবেতভাবে সরবে যিকির করা হয়ে থাকে। আমি একদল লোককে সরবে সমস্বরে যিকির করতে দেখে নীরবে এককভাবে যিকির

৪. *মাওলানা আকরামুযযামান, সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত, পৃঃ ৬২।*

করতে বললাম এবং এ নির্দেশের জন্য সূরা আ'রাফের ৫৫নং আয়াত দেখতে বললাম। তারা সে আয়াত দেখে বললেন, 'কথা ঠিকই'। এরূপ সিলসিলা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে বলে পূর্ববৎ যিকর আরম্ভ করল। আফসোস! পবিত্র কুরআনের আয়াত দেখিয়েও আমল পরিবর্তন করা গেল না।

তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম জনগণ ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অথচ তা ছহীহ বুখারীতে মা আয়েশা বর্ণিত ৬০৮ নং হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী। তাছাড়া ২০ রাক'আতের কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

এদেশের অনেক বড় বড় আলেমের অভিমত, চার মাযহাব মানা ফরয। সম্ভবতঃ এ কারণে কেউ কেউ মাযহাব ভিত্তিক ফিক্বহ শাস্ত্রকে বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের উপরে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অথচ দ্বীন সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে, তারা এ ফরযে আদৌ বিশ্বাসী নন। কেননা প্রচলিত চার মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে ইমামদের ইন্তিকালেরও অনেকে পরে। তাছাড়া চার ইমামের কেউই তাদের স্ব স্ব নামে মাযহাব সৃষ্টির কথা বলে যাননি। বরং তাঁরা সকলেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়ার জোর তাকীদ করেছেন। এক্ষেত্রে আল্লামা শা'রানী (রহঃ)-এর মন্তব্যটিই প্রণিধানযোগ্য যে, ইমামদের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই। তাছাড়া মাযহাব মানা ফরয হ'লে এ নির্দেশ নিশ্চয়ই আল্লাহ বা তাঁর রাসূল এর পক্ষ থেকে আসতো।

ছালাতের প্রত্যেক ধাপেই প্রায় বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ মুছল্লী নাভীর নিচে হাত বাঁধেন, যা বিশুদ্ধ হাদীছের পরিপন্থী। নারী-পুরুষ সকলের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা ছহীহ হাদীছ সম্মত। আর নারী-পুরুষ সকলের জন্য ছালাতের পদ্ধতি প্রায় একই। কিন্তু নারী-পুরুষের জন্য ছালাতের আহকাম-আরকানে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রবর্তিত বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ রকম অসংখ্য বৈসাদৃশ্য মুসলিম সমাজে বিরাজ করছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হ'ল।

পরিশেষে বলব, মুসলিম জনগণের মধ্যে ইবাদতের ক্ষেত্রে এত বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এসব বৈসাদৃশ্য দূরীভূত হওয়া একান্ত যরূরী। আর এজন্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি আবেদন, নিজেরাই অনূদিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করুন। অবশ্যই এতে ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়বে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আরয, মুসলিম জনগণের মধ্যে আগের ঐক্য ফিরিয়ে দিন। দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেই আমরা আবার পূর্বের সে মহান মুসলিম জাতিতে পরিণত হ'তে পারব। আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে বিশ্বের বুকে সমুন্নত করার জন্য সকল মুসলিম জনমনে ঐক্যের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে কাতর আবেদন জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

ইসলাম ও উত্তরাধিকার আইন

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

ইসলাম উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে সুস্থ নীতি প্রদান করেছে। পিতার সম্পত্তিতে ছেলের পাশাপাশি মেয়ের অধিকারের প্রসঙ্গটি আলোচনা করলে দেখা যায় এতে স্বাভাবিকতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও সুবিচার শতভাগ বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ও ইসলাম অনুমোদিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্ষেত্রে মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনে কোনরূপ অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য নেই। প্রচলিত আইনের আলোকে এবিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

(ক) কন্যা থাকাকালীন নারীর সকল দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। স্ত্রী হওয়ার পর তার ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় দায়িত্ব চলে আসে স্বামীর উপর। তার তো সম্পত্তির আর প্রয়োজন নেই। তবু ইসলাম পিতার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেক তাকে দিতে বলেছে।

(খ) বিয়ের সময় দেনমোহর স্ত্রীর অতিরিক্ত প্রাপ্য। এছাড়া কোন কারণে তার তালাক হলে সে কোথায় আশ্রয় নেবে?

(গ) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে পুরুষগণের উপর। শুধু তাই নয়, পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব, আত্মীয়-স্বজনকে আপ্যায়ন ও সহযোগিতার বিষয়গুলো তাকেই সামলাতে হয়। পিতা-মাতা ভরণ-পোষণের অভাবে আদালতে মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে তা এমনিতেই খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষ এই অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারে না।

(ঘ) পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেক পাবার পরও বোনের বিপদে ভাইকেই সহযোগিতা করতে হয়। যা অন্যান্য ধর্মে কল্পনা করাও কঠিন। যেমন- হিন্দু আইনে বিয়ের সময় যা দেয়, তারপর আর কোন দাবি-দাওয়ার সুযোগ নেই। নতুন ধারনায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্ত্রীর অর্জিত সম্পদেও স্বামী সমান ভাগ পাবে। শেষতক ফলাফল একই হবে।

(ঙ) ১৯৩৭ সালে বৃটিশ সরকার শরীয়ত এপ্লিকেশন এ্যাক্ট পাস করেছে। ১৯৬০ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুমোদন দেয় পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতার পরও তা বলবৎ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত ফর্মূলা বীজগণিতে সূত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ। এই সূত্রের কোথাও বিচ্যুতি ঘটলে অংকের ফলাফল ভুল হবে।

*বুড়িচং, কুমিল্লা।

(চ) এ সম্পর্ক আইন বিজ্ঞানীগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। প্রখ্যাত আইন বিশারদ গাজী শামসুর রহমান তাঁর ফারায়েজ আইন গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন- উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অবদান বৈপ্লবিক।

আইন বিশারদ ম্যাকনোটেন এর মতে, ইসলামী ওয়ারিছী আইন মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার ভিত্তির নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার আধিক্য, সেখানে প্রাপ্য অংশও আনুপাতিকভাবে অধিক। এর চাইতে সুন্দর নৈতিক ও বিবেকসম্মত ওয়ারিছী আইন সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের ব্যাপারে অকল্পনীয়।

মুসলিম আইনবিজ্ঞানী তৈয়বজী বলেন, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন তার পূর্ণতার জন্য সর্বদা প্রশংসিত হয়ে এসেছে। শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, ব্যক্তির সমন্বয়ে যে শ্রেণী গঠিত হয়, তার জন্যও এই আইন ব্যবস্থা করেছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিবর্তনের ব্যবস্থা এই আইনে নিখুঁত। সকল দাবির সুষ্ঠু সমাধান এই আইনে পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার প্রশ্নের মীমাংসায় তাই এই আইন সার্থক।

(ছ) ইসলামের উত্তরাধিকার আইন কোন নারীকেই বঞ্চিত করেনি। বরং দাদী বা পিতামহীকেও নাতির সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা ফুফুর দায়িত্ব ভাতিজাকেই নিতে হয়। এছাড়া অছিয়তের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে ভাইয়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মানে পুরুষের সাথে বিবাদ করা। কেননা একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাকে রদ করার চিন্তায় কোন পক্ষের প্রতিপক্ষ হ'লে, স্বজাতির পক্ষে দাড়িয়ে তারা যদি বলেন, ঠিক আছে। আপনি যেহেতু পুরুষ বিরোধী, সুতরাং পিতার সম্পত্তি নয়, মায়ের সম্পত্তিই শুধু আপনার পাওয়া উচিত। তখন কী করবেন? না তাদের এ দাবি অযৌক্তিক হবে? অতএব, অসঙ্গতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করা কারো জন্যই শুভ নয়।

(জ) নারী যদি একটি বিষয়কে নিজের সম অধিকার বলে মনে করে, তবে সার্বিক অর্থে তারা ঠকবেন। কুরআন নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়, বরং সহায়ক। কুরআন ঘোষিত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নারীকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার দিয়েছে এর পূর্বে অন্য কোন ধর্ম তা দিতে পারেনি। এখনও পারছে না। তাছাড়া সম অধিকারের প্রশ্ন আনলে, সমকর্তব্যের প্রসঙ্গটি বাধ্যতামূলকভাবেই আসবে। তারা কি ঝুঁকিপূর্ণ ও ভারী কাজগুলো করতে সক্ষম? এটা মূলতঃ স্বভাব বিরোধী। ইসলাম নারীকে ঘরের এবং পুরুষকে বাইরের কর্তৃত্ব দিয়েছে। এলামেলো হলে গণ্ডগোল সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এলোমেলো যারা করতে চায়, তাদের বিবেকবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করার জন্য সমঅধিকারের ধোয়া তোলা হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধনকে ধ্বংস করে সামাজিক শৃংখলা ভঙ্গের এই আইন অবশ্যই প্রত্যাহার করা উচিত। নইলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হবে। সামাজিক ভারসাম্যতা হবে বিপন্ন।

(ঝ) কুরআনে বর্ণিত সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কিত এই আইনের পরিবর্তনকে সীমালংঘন হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। সীমালংঘনকারীদেরকে কুরআনুল কারীমে অভিশপ্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পত্তি বন্টনের অধ্যায়টি একটি চেইন বা শিকল। এর কোথাও পরিবর্তন আনতে হলে শত শত স্থানে সংশোধনী বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। সুতরাং গায়ে পড়ে নতুন ঝামেলায় পা দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

(ঞ) বৃটিশ আমলের ১৯০ বছরে তারা যে আইনে হাত দেওয়ার সাহস করেনি, হিন্দু অধ্যুষিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যে আইনের প্রতি এখনও শ্রদ্ধা বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল উপদেষ্টা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হাযার বছর ধরে প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিধিবদ্ধ একটি মৌলিক আইনকে পরিবর্তন করার কী এমন প্রয়োজন পড়েছে? শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে কুরআন বিরোধী, সামাজিক ভারসাম্যতা বিনষ্টকারী এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বাইরে কোন আইন বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব।

পরিশেষে বলব, ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮-এর ৯.৫ ধারা ও ৯.১৩ ধারার মধ্যে আনীত ইসলামী আইনের বিরোধী অংশগুলোকে অবিলম্বে সংশোধন আবশ্যক। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব সরকার যে আইন করতে গিয়ে গণধিক্কারের শিকার হয়েছিলেন, আজকেও সেই একই অবস্থা সৃষ্টি হ'তে পারে। কয়েকটি নারীবাদী সংগঠনের চাপে পড়ে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া সরকারের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া এটা তাদের দায়িত্বও নয়। যে নীতির প্রতি অধিকাংশ নারীরই সমর্থন নেই, কুরআন-হাদীছ বিরোধী এই নীতির কারণে সরকারের অর্জিত সুনামগুলো ধুলায় মিশে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকবে না।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অজানা

মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্যই। পৃথিবীর এই সমাজ ব্যবস্থায় ধনী মানুষ যেমন আছে, তেমনি আছে দরিদ্রও। আর এই ধনী ও দরিদ্রের মাঝে রয়েছে বিশাল ভেদাভেদ। সমাজে যারা একটু অর্থবিত্তশালী তারা দরিদ্রদের সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখে। তারা দরিদ্রদের পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না। অর্থ-সম্পদের মোহে পড়ে অনেক সময় তারা ধর্ম ও ধর্মের অনুশীলন ভুলে যায়। ভুলে যায় ধর্মের বিধিবিধানকে। এ সম্পর্কে একটি গল্প নিম্নরূপঃ

এক গ্রামে বাস করত এক দরিদ্র কৃষক। সে অপরের জমিতে শ্রম খাটিয়ে কোন মতে জীবন যাপন করত। সবার সাথে সে মিলেমিশে থাকত। গ্রামে এক ধনী প্রভাবশালী বাস করত। তার ছিল অঢেল সম্পদ। গ্রামের কারো অবস্থার পরিবর্তন তার কাছে অসহনীয় ছিল। একদিন খুব সকালে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁত পরিস্কার করছিল। এমন সময় দেখতে পেল কৃষক লোকটি তার দিকে আসছে। লোকটি তাকে সালাম দিয়ে দ্রুত চলে গেল।

অন্য একদিন গভীর রাতে একইভাবে সে দেখতে পেল যে, কৃষক লোকটি যেন কোথা থেকে আসছে। সে লক্ষ্য করল কৃষক লোকটির মুখে হাসি। আগের দিনের মত একইভাবে তাকে সালাম দিয়ে চলে গেল। ধনী লোকটি খুব অবাক হ'ল। তার মাঝে সন্দেহের জাল বিস্তার করতে শুরু করল।

আরেক দিন সে কৃষক লোকটিকে হাট থেকে একটু বেশী জিনিসপত্র ক্রয় করতে দেখল। কিছুদিন পর গ্রামবাসী জানতে পারল যে, ধনী লোকটির কিছু সম্পদ তার গুদাম থেকে হারিয়ে গেছে। তাই সকলে ভয়ে অস্থির। আর এজন্য ধনী লোকটিও খুব রেগে আছে। কোনক্রমেই সে চোরের সন্ধান পাচ্ছে না। চোর ধরার জন্য একটু রাত করে সে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় সেই কৃষকের সাথে তার দেখা। তাকে সালাম দিয়ে কৃষক তার গন্তব্যের দিকে চলল। এ সময় ধনী লোকটি জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে? কৃষক হেসে হেসে বলল, বাণিজ্যে। অতঃপর ব্যস্ত আছি বলে দ্রুত চলে গেল। উল্লেখ্য, কৃষকের বাড়ি ছিল তার গুদামের একটু সামনে। ধনী লোকটি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, চাল-চুলাহীন এক সামান্য কৃষক! সে কেমন করে বাণিজ্য করবে? পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি করে গুদামের কাছে গেল। কাছে যেতেই গুদাম ঘরের বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। গুদামে প্রবেশ করে বুঝতে পারল পূর্বের ন্যায় তার গুদামপণ্যে চোরের হাত পড়েছে। তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হ'ল। আর তখনই কৃষকের সাথে দেখা হ'ল। সে পূর্বের ন্যায় তাকে সালাম দিল। ধনী লোকটি লক্ষ্য করল, কৃষক যেন সারা রাত জেগে জেগে অনেক পরিশ্রম করেছে, তাকে খুব ক্লান্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তবুও তার মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। ধনী লোকটি কৌতুহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে? এবার কৃষক লোকটি একটু বাড়িয়ে বলল,

দিনের বাণিজ্য রাতেরে ভাই
সময়ের কাজ সময়ে করেছি
ভীষণ খুশি তাই।
কাধের বোঝা ফেলে এলাম
অধিক মূল্য নিয়ে এলাম।

এ বলে সে চলে গেল। তার ঐ পাঁচটি বাক্যে ধনী লোকটির কাছে মনে হ'ল, তার সকল ক্ষতির জন্য কৃষকই দায়ী। তাই সে গ্রামের কিছু লোককে ঘটনা খুলে বলল। গ্রামের লোকেরা তার বিচারের ব্যবস্থা করল। কৃষককে টেনে হিছড়ে নিয়ে এসে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই বেদম প্রহার করা হ'ল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল না কেন তাকে এভাবে প্রহার করা হচ্ছে। অবশেষে যখন তাকে গুদামের মালের কথা জিজ্ঞেস করা হ'ল তখন বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কার হ'ল। সে চিৎকার করে বলল, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। চুরির কথা অস্বীকার করায় তাকে আবার প্রহার করা হ'ল। এক সময়ে তার দেহ নিঃসাড় হয়ে পড়ল। প্রহার বন্ধ করে সবাই খেয়াল করল লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারা মাথায় ও মুখে পানির ছিটা দিয়ে তার হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর লোকটি চোখ খুলে অসহায়ভাবে সবার দিকে তাকাল এবং হাত জোড় করে অতি কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনারা বিশ্বাস করুন আমি চুরি করিনি। আমি খুবই ক্লান্ত, আমি খুবই দুর্বল। দয়া করে আমাকে আর প্রহার করবেন না। তখন অনেকে কানাকানি করতে লাগল যে, মনে হয় কৃষকের কোন দোষ নেই।

অযথা তার উপর অমানবিক অত্যাচার দেখে এক ব্যক্তি আর সহ্য করতে পারল না। সে বলল, কৃষক যে চুরি করেছে তার প্রমাণ কি? তখন ধনী লোকটি সবার সামনে তার সন্দেহের বিষয়টি প্রকাশ করল যে, কৃষককে সে অনেকবার গভীর রাতে এবং খুব সকালে বাড়ি ফিরতে দেখেছে। আর যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন সে উত্তর দিয়েছে ঐ পাঁচটি সন্দেহযুক্ত বাক্য দ্বারা। সে আরো বলল, যখন আমি তাকে দেখেছি তখন তাকে ব্যস্ত ও ক্লান্তমনে হয়েছে।

এ সময় কৃষককে উক্ত বাক্যের অর্থ জিজ্ঞেস করলে সে আস্তে আস্তে সব খুলে বলল যে, সে একজন দরিদ্র কৃষক। সারাদিন কাজ করে বলে দিনে নফল ইবাদত করার মত যথেষ্ট সময় ও সুযোগ সে পায় না। তাই সে গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। দিনের বাণিজ্য রাতে এ কথার অর্থ এটাই যে আমি দিনের ইবাদত রাতে করি। সময়ের কাজ সময়ে বলতে প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা বুঝিয়েছি। দিনের নফল ইবাদতের চেয়ে রাতের ইবাদতে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। যাকে অধিক মূল্য বুঝাতে চেয়েছি। মানবজীবন বিভিন্ন পাপ-পঙ্কিলতায় পূর্ণ। মানুষের কাধে যে পাপের বোঝা তা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু মানুষ যখন ছালাত আদায় করে তখন তার সমস্ত পাপ ঝরে পড়ে। এক সময় সে পাপ থেকে মুক্ত হয়। আর ঈমানদার বান্দা অধিক মূল্য তথা নেকী নিয়ে ঘরে ফেরে। এই ছিল আমার উক্ত পাঁচটি বাক্যের অর্থ।

কৃষক লোকটি যখন এক এক করে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিল, তখন সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সবার ভুল ভাঙ্গল। বিচারকরা মাথা নিচু করে থাকল। সবাই অনুতপ্ত হয়ে কৃষকের নিকট ক্ষমা চাইল। আর একজন নিরপরাধ নির্দোষ মানুষের প্রতি অযথা সন্দেহ করার জন্য সবাই ধনী লোকটিকে ধিক্কার জানাল।

** মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন*
তেরখাদা, খুলনা।

চিকিৎসা জগত

এলার্জিজনিত রোগ ও চিকিৎসা

এলার্জি বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের কাছে এক অসহনীয় ব্যাধি। এলার্জির কারণে হাঁচি থেকে শুরু করে খাদ্য ও ওষুধের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ও শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এলার্জি সমান্যতম অসুবিধা করে, আবার কারো ক্ষেত্রে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ঘরের ধুলাবালি পরিষ্কারের সময় হঠাৎ করে হাঁচি এবং পরে শ্বাসকষ্ট অথবা ফুলের গন্ধ নেওয়ায় কিংবা গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ মাছ ও গরুর দুধ খেলেই শুরু হয় গা চুলকানি বা চামড়ায় লাল লাল চাকা হয়ে ফুলে ওঠা। এগুলো হ'লে এলার্জি আছে ধরে নিতে হবে। এলার্জি কী, কেন হয় এবং কী করে এড়ানো যায়, আলোচ্য নিবন্ধে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে। কোন কারণে এই ইমিউন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে তখনই এলার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এলার্জিঃ

আমাদের শরীর সবসময়ই ক্ষতিকর বস্তুকে (পরজীবী, ছত্রাক, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া) প্রতিরোধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাকে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউন বলে। আমাদের শরীর সাধারণত ক্ষতিকর ভেবে কোন কিছুকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণত ক্ষতিকর নয়, এমন সব বস্তুর প্রতি শরীরের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে এলার্জি বলা হয়। এলার্জি সৃষ্টিকারী বহিরাগত বস্তুগুলোকে এলার্জি উৎপাদক বা এলার্জেন বলা হয়।

এলার্জিজনিত প্রধান সমস্যাঃ এলার্জির কারণে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হয়। আমরা এখানে প্রধান কতিপয় সমস্যা উল্লেখ করব।

এলার্জিজনিত সর্দি বা এলার্জিক রাইনাইটিস

এর লক্ষণ হচ্ছে অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে পানি পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কারো কারো চোখ দিয়েও পানি পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়। এলার্জিক রাইনাইটিস দুই ধরনের। যথা-

সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিসঃ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় এলার্জিক রাইনাইটিস হ'লে একে সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

এতে ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও চোখ দিয়ে পানি পড়ে ও চোখে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়।

পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিসঃ সারা বছর ধরে এলার্জিক রাইনাইটিস হ'লে একে পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটস বলা হয়।

পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গগুলো সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিসের মতই। তবে এ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম হয় এবং স্থায়িত্বকাল বেশী হয়।

অ্যাজমা বা হাঁপানিঃ

* অ্যাজমা হ'লে কাশি, ঘন ঘন শ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো শব্দ হয় বা বুকে চাপ চাপ লাগে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ঠাণ্ডা লাগে।

অ্যাজমা রোগের প্রধান উপসর্গ বা লক্ষণগুলো হ'লঃ

- বুকের ভিতর বাঁশির মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ।
- শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট হওয়া।
- দম খাটো অর্থাৎ ফুসফুস ভরে দম নিতে না পারা।
- ঘন ঘন কাশি।
- বুকে আটসাট বা দম বন্ধ ভাব।
- রাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকা।

একজিমাঃ একজিমা বংশগত চর্মরোগ, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়, চুলকায়, আঁশটে এবং লালচে হয়। খোঁচানোর ফলে ত্বক পুরু হয় ও কখনো কখনো উঠে যায়। এর ফলে ত্বক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ত্বক থেকে চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে এবং দেখতে ব্রণ আক্রান্ত বলে মনে হয়। এটা সচরাচর বাচ্চাদের মুখে ও ঘাড়ে এবং হাত ও পায়ে বেশী দেখা যায়।

এলার্জিক কনজাংটাইভাইটিসঃ

এ রোগের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে চোখ চুলকানো ও লাল হয়ে যাওয়া।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাঃ

রক্ত পরীক্ষাঃ রক্তে ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশী আছে কি-না তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা।

সিরাম আইজিই'র মাত্রাঃ সাধারণত এলার্জি রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিই'র মাত্রা বেশী থাকে।

স্কিন প্রিক টেস্টঃ এ পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার উপর বিভিন্ন এলার্জেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় কোন কোন জিনিসে রোগীর এলার্জি আছে, তা ধরা পড়ে।

প্যাচ টেস্টঃ এ পরীক্ষা করা হয় রোগীর ত্বকের উপর।

বুকের এক্স-রেঃ হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে দেখা দরকার যে, অন্য কোন কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি-না।

স্পাইরোমেট্রি বা ফুসফুসের ক্ষমতা পরীক্ষাঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীর ফুসফুসের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

এলার্জির চিকিৎসাঃ সমন্বিতভাবে এলার্জির চিকিৎসা হচ্ছে এলার্জেন পরিহার করা। যখন এলার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা পরিহার করে চললেই সহজ উপায়ে এলার্জি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ওষুধ প্রয়োগঃ এলার্জিভেদে ওষুধ প্রয়োগ করে এলার্জি অনেকটা উপশম হয়।

এলার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুনোথেরাপিঃ এলার্জি দ্রব্যাদি থেকে এড়িয়ে চলা ও ওষুধের পাশাপাশি ভ্যাকসিনও এলার্জিজনিত রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার অনেক কমে যায়। ফলে কর্টিকোস্টেরয়েডের বহুল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও এই ভ্যাকসিন পদ্ধতির চিকিৎসাকে এলার্জিজনিত রোগের অন্যতম চিকিৎসা বলে অভিহিত করেছে। এটা এলার্জি রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ থাকার একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি।

আগে ধারণা ছিল এলার্জি হ'লে আর সারে না। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রথম দিকে ধরা পড়লে এলার্জিজনিত রোগ একেবারে সারিয়ে তোলা সম্ভব। অবহেলা করলে এবং রোগ অনেক দিন ধরে চলতে থাকলে নিরাময় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

ইউরিয়া সারের বিকল্প হ'তে পারে অ্যাজোলা

বহুদিন ধরে দেশে সার সংকট চলছে। কৃষক চাহিদামত সার পাচ্ছে না। চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে সারের অভাবে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু সার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি আজো।

যে সার নিয়ে দেশব্যাপী হৈচৈ, সে জৈব (ইউরিয়া) সারের বিকল্প হ'তে পারে অ্যাজোলা। এর ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ কৃষকের ধারণা না থাকায় পরিবেশবান্ধব এই অ্যাজোলা কৃষকদের কাছে এখনো গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অথচ এর ব্যবহারে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি হেক্টরে এক টন অতিরিক্ত ফসল ফলানো সম্ভব। এ তথ্য জানিয়েছে 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (ব্রি)।

রাস্তার দুই পাশে কিংবা জলাশয়ে দেখা যায় এক ধরনের খুদে পানা, যা নানা স্থানে প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে। একে কেউ বলে সূতিপানা, কেউবা তেঁতুলে পানা, আবার কারও কাছে শুধুই পানা। জলজ সবুজ কিংবা পাটল রঙের এই পানার বৈজ্ঞানিক নামই 'অ্যাজোলা'।

অ্যাজোলা পাতার খাঁজে খাঁজে থাকে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী অণুজীব, নীল ও সবুজ শেওলা। ধানক্ষেতের পানিতে এদের ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। যখন এগুলো মারা যায় বা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলো থেকে উৎপাদিত নাইট্রোজেন ধানগাছের অত্যন্ত উপকারে আসে।

অ্যাজোলা বাংলাদেশের বাইরে ভিয়েতনাম ও চীনের কৃষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও অ্যাজোলা নিয়ে জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কাজ করছে। যেখান থেকে আমাদের পরিবেশের উপযোগী বেশ কিছু প্রায়োগিক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ কৃষকেরই অ্যাজোলা বা এর উপকার সম্পর্কে ধারণা নেই। সবার কাছে এটি অতি সাধারণ পানা। এই পানা যে জৈব সারের বিকল্প হ'তে পারে, সে সম্পর্কে বেশীর ভাগ কৃষকেরই ধারণা নেই।

নিচু জায়গায় বা জমির পরিত্যাক্ত অংশে এই ছোট পানা দেখা যায়। কৃষকরা একে ধানের জন্য আগাছা মনে করে ফেলে দেয়। এই ছোট পানা ইউরিয়া সারের বিকল্প হ'তে পারে। এগুলো সংগ্রহ করা কষ্টকর এবং ঝামেলার কাজ মনে করে কৃষকরা বেশী দামী ইউরিয়া সারের প্রতি ঝুকে পড়ে। অথচ রাসায়নিক সার ক্ষতিকারক। পক্ষান্তরে এই 'অ্যাজোলা' থেকে তৈরী সারে কোন প্রকার ক্ষতি নেই বরং এটা পরিবেশ বান্ধবও বটে।

হবিগঞ্জ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাজোলার চাষ করছে। পাশাপাশি আশপাশের গ্রামের কৃষকদের কী করে অ্যাজোলার চাষ বা জমিতে প্রয়োগ করতে হয়, সেই ধারণা দিচ্ছে। অনেকেই এখান থেকে অ্যাজোলা বিষয়ে ধারণা নিচ্ছে। ব্রি'র মতে, অ্যাজোলার মজুদ তৈরীর জন্য সার্বক্ষণিক একটি নার্সারী বানাতে হবে। এ নার্সারীর জন্য পানি দাঁড়াতে পারে, এমন জায়গা বেছে নেওয়া দরকার। গভীর বা অগভীর নলকূপের নালার পাশের জায়গা হ'লে ভাল হয়। তাছাড়া রাস্তার পাশের নিচু খাদ অথবা মৌসুম শুরু হওয়ার একটু আগে নিজের জমিতেই পানি জমিয়ে জমির এক কোনায় চৌবাচ্চা কেটে অ্যাজোলার নার্সারী করা যায়। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চার মিটার করে এবং কমবেশী ৩০ সেন্টিমিটার গভীর করে গোটা চারেক চৌবাচ্চা তৈরী করতে হয়। সব সময়ই এ চৌবাচ্চাগুলোতে যেন ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি জমে থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর প্রতি বর্গমিটারে ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম তাজা অ্যাজোলা ছেড়ে দিতে হবে। সাত-আট দিন পর প্রতি বর্গমিটারে এক গ্রাম টিএসপি ছিটিয়ে দিতে হবে। ফলে তরতর করে অ্যাজোলার মোটা চাদর তৈরী হবে। রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লাউ-কুমড়ার জাংলার মতো মাচান তৈরী করে দিলে ভাল হয়। তখন এ চাদরের রং হবে সবুজ বা পাটল রঙের। এটাকে অ্যাজোলার বাফার ষ্টকও বলা যায়।

এক হেক্টর জমিতে ১,৫০০ টাকার ইউরিয়ার প্রয়োজন হয়। অথচ একই পরিমাণ জমিতে এক হাজার কেজি অ্যাজোলা ব্যবহার করলে খরচ কমে আসবে অর্ধেকেরও বেশী।

হবিগঞ্জ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, ইউরিয়ার চাহিদা অ্যাজোলা দিয়ে মেটানো সম্ভব। অ্যাজোলার অঙ্গজ বিস্তারণক্ষমতা খুব চমৎকার। দিনে হেক্টরে প্রায় এক টন তাজা জৈব পদার্থের সমান। সঙ্গে বাতাস থেকে দুই কেজি নাইট্রোজেন ধরে রাখতে পারে, যা দিয়ে পাঁচ কেজি ইউরিয়ার কাজ চালানো যায়। এক হেক্টর অ্যাজোলার আস্তরণ তৈরী করতে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। অতি অল্প সময়ে কৃষকেরা চাহিদা অনুযায়ী অ্যাজোলার ব্যবহার শুরু করতে পারেন।

হবিগঞ্জ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, ইউরিয়া মাটির উর্বরতা হ্রাস করে। নাইট্রেট মাটি ও পানির সঙ্গে মিশে পরিবেশের জন্য হুমকি তৈরী করে। অথচ অ্যাজোলা পরিবেশবান্ধব জৈব সারের বিকল্প হ'তে পারে। অ্যাজোলা বিষয়ে সাধারণ কৃষকদের ধারণা নেই। এ কারণে সবাই ইউরিয়া সারের প্রতি ঝুঁকছে। জৈব সারের অভাব পূরণ করে এই অ্যাজোলা। মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ জমতে সহায়তা করে। পানি থেকে আর্সেনিক ছেঁকে নেয়। পাশাপাশি মাটির গুণ ভাল রাখে। এ কারণেই কৃষকদের উচিত চাষাবাদে অ্যাজোলা ব্যবহার করা।

[সংকলিত]

কবিতা

যালিম ও মাযলূম

- আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

বিষাদে ভরে যে মন স্মরণ হ'লে সেই কথা
বিনা অপরাধে বন্দী হ'লেন আমাদের চার নেতা।
আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার
আব্দুছ ছামাদ সালাফী, নূরুল ইসলাম, আযীযুল্লাহ সাথী হ'লেন তাঁর।
সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে কভু না ভুলিতে পারি
দুই হাযার পাঁচ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী।
জঙ্গীবাদের সন্দেহে তাদের করেছিল কারাবন্দী
মিথ্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর মিথ্যা ছলনা ফন্দী।
এদেশের যারা কৃতি সন্তান কৃতিত্বের অধিকারী
উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক গোষ্ঠীর উচ্চ মর্যাদাধারী।
জাতি গঠনের দায়িত্ব যাদের যুগে যুগে কালে কালে
তারাই জাতির অন্ধকারে আলোর প্রদ্বীপ জ্বালে।
তাহাদেরই রাখে বন্দী করিয়া এ কোন শাসক দল
মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া শুধু করে দেয় হীনবল।
তিন নেতা মোদের মুক্তি পেলেন সতেরো মাস পরে
ডঃ গালিব পায়নি মুক্তি এখনো তিনি কারাগারে।
এমনি কতই আলেম-ওলামা নির্যাতনের মাঝে
করে বদদো'আ স্রষ্টার কাছে সকাল-সন্ধ্যা-সাঁঝে।
এবার মযলূমের দো'আ বুঝি কবুল করিলেন পরোয়ারে
আযাব-গযব তাই তো বুঝি আসিল দেশের পরে।
দেশের উপর আল্লাহ্‌র গযবে চারিদিকে হাহাকার
সিডর আসিয়া হানিল আঘাত করে দিল ছারখার।
যালিমের সাজে যুলুম যাহারা করেছিল এতদিন
তাদের উপর দিলেন আযাব রাব্বুল আলামীন।
তাদেরই তৈরী কারাগারে তারা সবাই হইল বন্দী
জোট ও বিরোধীদের নস্যাৎ হইল সকল দুরভিসন্ধি
এদেশ তাহারা লুটপাট করে খাইয়াছে কালে কাল
গাড়ী বাড়ী আর সম্পদ তাদের তাই আজ বেসামাল।
বেহাল দশা সকল দলের নেতা ও নেত্রী নাই
হিসাব দিতে অবৈধ সম্পদের জেলে বসে খাবি খায়।
দুর্নীতিবাজ যালিম শোষক শোষণ করিল দেশ
শুধু হাহাকার সোনার দেশে শান্তির নাহিক লেশ।
বিশ্বের কাছে বদনাম হ'ল কেবলই বাঙ্গালী জাতি
দুর্নীতিবাজ দস্যু তস্কর এদেরই গোষ্ঠী জ্ঞাতি।
দুই হাযার সাত সালের কথা চিরদিন মনে রবে
দেশ নিয়ে কেমন করেছিল খেলা নেতা-নেত্রীরা সবে।
তাই শুধু মনে হয় যাইতাম দেখিতে সময় সুযোগ পেলে
বলিতাম গিয়া নেতা-নেত্রীরা কেমন আছেন জেলে?

হিসাব দিতে হবে

- মুহাম্মাদ আবুল কাশেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

আজব কথায় গুজব তুলে
ভুগছে কালা জ্বরে
উদর বোঝা বুদর ঘাড়ে
চলছে জগৎ জুড়ে।
দুঃখে যাদের জীবন গড়া
সুখের আশা যায় ভুলে
তবু তাদের দুঃখ আসে
চক্রকারীর ঐ জালে।
সত্য যাদের প্রতিশ্রুতি
করবে তারা কিসের ভয়
বিপদে যারা ধৈর্য ধরে
আল্লাহ তাদের সহায় হয়।
ষড়যন্ত্রের কবল থেকে
পায়নি রেহাই ইমামগণ
হক্বের দাওয়াত দিতে গিয়ে
জীবন দিয়েছেন বিসর্জন।
তারা আবার জোট বেঁধেছে
সকল জাতি মিলে
ইসলামের ধার না ধারে
প্রগতির যিকর তোলে।
বাড়ীর মালিক চুরি করে
দোষী হয় রাখাল
সত্য কথা গোপন করে
রাখবে আর কত কাল?
ডঃ গালিব নির্দোষ মানুষ
বন্দী কেন জেলখানায়?
অভিযোগ সব ভিত্তিহীন
তবুও কোন বিচার নাই।
কুচক্রীদের পাতা ফাঁদে
আহলেহাদীছ বন্দী হয়
কর্মের হিসাব দিতে হবে
দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাঠগড়ায়।

***

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

- মুহাম্মাদ ইমরান আলী
কয়ামাজমপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

আমরা যদি জাগতে পারি
গড়তে পারি আদর্শ দেশ
দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে
আধার হবে শেষ।
আমরা যদি ফুটতে পারি
ফোটা ফুলের মত
কুরআন-হাদীছের আইন চলবে
নিত্য অবিরত।
আমরা যদি জ্বালিয়ে দেই
কুরআন-হাদীছের আলো
তবেই এদেশ ধন্য হবে
ঘুঁচবে আধার কালো।

***

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। মন্ত্রী।
২। জেনারেল মঈন ইউ আহমাদ।
৩। এয়ার মার্শাল শাহ মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান।
৪। ভাইস এডমিরাল সরোয়ার জাহান নিজাম।
৫। জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ক্যালিপাস। ২। গ্যাভিমিটার। ৩। কার্ডিওগ্রাফ।
৪। ল্যাকটোমিটার। ৫। ক্রেসকোগ্রাফ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা বিষয়ক)

১। পৃথিবীতে কোন ভাষায় সর্বাধিক সংখ্যক লোক কথা বলে?
২। বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে?
৩। পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম?
৪। জান্নাতের ভাষা কি?
৫। পৃথিবীতে সর্বমোট ভাষার সংখ্যা কত?

** সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
শিংগাঁ মধ্যপাড়া, মান্দা, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?
২। কচুশাক কোন উপাদানের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান?
৩। কোন ভিটামিন ক্ষত স্থান হ'তে রক্তপড়া বন্ধ করে?
৪। স্যালিক এসিড কোথায় পাওয়া যায়?
৫। ভিটামিন 'এ' সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় কোন ফলে?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২ মার্চ রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখা দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে গঠনতন্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকায শাখার সোনামণি পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন সাধারণ সম্পাদক যুবায়ের আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ।

শুকলপট্টি, নাটোর ১৯ মার্চ বুধবারঃ অদ্য সাকাল ১১-টায় শুকুলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রধান অতিথি সোনামণিদেরকে সংগঠন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাজিদুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইশতিয়াক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল পৌনে ৭-টায় উত্তর নওদাপাড়া (কালুর মোড়) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেরকে ছালাত ও সালামের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রূপালী আখতার ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আসমা আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আবু নু'মান।

ভুগরইল, রাজশাহী ২১ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর মধ্যভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক ও উত্তর নওদাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম আবু নু'মানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শুকতারা এবং দ্বৈতকণ্ঠে জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ইলা খাতুন ও আফরোজা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মাহদী হাসান।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

রাজশাহীতে বিকল্প জ্বালানি ব্রিকুইটিং

প্রবাদে আছে 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন'। অনেক ফেলনা (উচ্ছিষ্ট) জিনিস কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু হয়েছে। প্রবাদ বাক্যের সেই ছাই দিয়ে রাজশাহীতে তৈরী হচ্ছে বিকল্প জ্বালানি। ইট ভাটাতে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর পর এতদিন ছাই ফেলে দেয়া হ'ত। সেই ফেলে দেয়া ছাইকে সামান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় জ্বালানি হিসাবে তৈরী করা হচ্ছে। এসব ছাইয়ের সাথে এরারুট মিশিয়ে ছোট ছোট গোলা তৈরী করা হচ্ছে। নাম দেয়া হয়েছে ব্রিকুইটিং। ব্রিক ফিল্ডের ছাই বলে এর সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজশাহীর বিসিক শিল্প এলাকার একাধিক কারখানায় এই ব্রিকুইটিং তৈরী হচ্ছে। প্রতি দশ মন ছাইয়ের সঙ্গে তিন কেজি এরারুট মিশিয়ে এক ধরনের মেশিনে তৈরী হয় ব্রিকুইটিং।

ব্রিকুইটিং ব্যবহারকারীরা বলছেন, চুলা ধরানোর সময় ধোঁয়া-ই যা সমস্যা। তবু এটা অনেক সাশ্রয়ী। গৃহিনীদের খুব পসন্দ। তাপ বেশী হওয়ার কারণে রান্না-বান্নায় সময় লাগে কম। আর হাঁড়ি-পাতিলের তলায় কালি ধরে না। ফলে ঘঁষা-মাজা কম করতে হয়।

নাসার ডাটাবেজে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র

নাসার স্মিথসোনিয়ান এস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরি পরিচালিত এস্ট্রোফিজিক্স ডাটা সিস্টেমে বাংলাদেশী গবেষক অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব ও তার সহকর্মীদের গবেষণাপত্র স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই ডাটাবেজে বিশ্বব্যাপী ফিজিক্স ও এস্ট্রোনমি বিষয়ে খ্যাতনামা গবেষণা জার্নাল সমূহে প্রকাশিত গবেষণার অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সারসংক্ষেপ স্থান পায়। যাতে স্বীয় বিষয়ে বিভিন্ন দেশের গবেষকরা সেই তথ্যভাণ্ডারকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সুদীপ্ত দেবের যে গবেষণাপত্রটি নাসার ডাটাবেজে সংরক্ষিত রয়েছে তার শিরোনাম হ'লঃ 'স্টাডি অব ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার এন্ড ইলাস্টিক প্রপার্টিজ অব ট্রাঞ্জিশন মেটাল এ্যান্ড একটিনাইড কার্বাইডস'।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লজ্ঘন বেড়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর বলেছে, বাংলাদেশে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারীর নির্বাচন বাতিল এবং যরূরী অবস্থা জারী করার পর সেদেশে মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে। গত ১১ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ২০০৭ সালের বাংলাদেশ সংক্রান্ত মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যরূরী অবস্থা জারী ও জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করার পর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০০৭-এর জানুয়ারীতে জারী করা যরূরী ক্ষমতা বিধিমালা বছর জুড়েই বহাল ছিল। ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা এবং জামিনের অধিকারসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার চর্চা বন্ধ থাকে। এই সময়ে যৌথবাহিনীর হাতে আটক সন্দেহভাজনদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে নির্যাতন, জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে রাযী হওয়ার বিনিময়ে সন্দেহভাজনদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলেও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জনপ্রিয়তা পেলেও শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলাগুলোর বিচার যথাযথ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কি-না তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে সরকার অঘোষিতভাবে গৃহবন্দী করে রাখে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, গত বছর র‌্যাবের হাতে নিহত হয়েছে ৯৪ জন। গড়ে প্রতি মাসে নিহত হয়েছে আটজন করে। আগের বছর ২০০৬ সালে প্রতি মাসে এ ধরনের হত্যার ঘটনা ছিল ১৫টি। তাছাড়া ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে তিন লাখেরও বেশী মানুষ গ্রেফতার হয়েছে জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেফতার হওয়া মানুষের সংখ্যা এর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫ শতাংশেরও বেশী।

[বাংলাদেশের মানবাধিকার সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের উক্ত রিপোর্টটিতে সাম্প্রতিক সময়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রিপোর্টের অপূর্ণাঙ্গতা বেশ পরিষ্কার। মূলতঃ বাংলাদেশে কী পরিমাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে সেটিই দেখার বিষয়। যে দেশে বিনা অপরাধে বছরের পর বছর মানুষ কারানির্যাতন ভোগ করে, পরিকল্পিতভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত করা হয়, সেদেশে মানবাধিকার বলতে আর কিছু থাকে কি? প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দীর্ঘ তিন বছর যাবত তিনি বিনা অপরাধে কারাবন্দী আছেন। তাঁর ব্যাপারে ন্যক্কারজনকভাবে মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়ে আসছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সহ মানবাধিকারের ধ্বজাধারিরা থেকেছে নিশ্চুপ। এ রকম হাযার হাযার মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে। সুতরাং যে দেশে মানবাধিকার শব্দটি কেবলমাত্র খোলস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদেশ সম্পর্কে এই মন্তব্য অন্তসার শূন্য। -সম্পাদক]

তথ্য অধিকার আইন ২০০৮-এর খসড়া প্রণয়ন

নাগরিকদের সরকারী-বেসরকারী যে কোন তথ্য প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করে সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৮ এর খসড়া তৈরী করেছে। এই আইনে তথ্য চেয়ে কোন নাগরিক আবেদন করলে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে। ভুল তথ্য দেয়া হ'লে জরিমানার ব্যবস্থাসহ শাস্তির বিধান থাকছে এ আইনে। তথ্য কর্মকর্তার উপর আবেদনের তারিখ হ'তে প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত হারে জরিমানা আরোপ করা হবে। এ জরিমানার পরিমাণ ২৫ হাযার টাকার বেশী হবে না। বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে এ অধ্যাদেশের খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পর অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-১৯২৩ বা সমসাময়িক কোন আইনে যাই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশই কার্যকর হবে। এই অধ্যাদেশের অধীনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা বা বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকলে তা প্রকাশ বাধ্যতামূলক হবে না। তাছাড়া যেসব তথ্যের প্রকাশ জননিরাপত্তা, আইনী প্রক্রিয়া, তদন্ত প্রক্রিয়া বা অপরাধীর গ্রেফতার বাধাগ্রস্ত কিংবা অপরাধকে উৎসাহিত করবে সে তথ্যের জন্য আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারে। এই খসড়ায় বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়, সরকারী, আধা সরকারী অফিস, অধিদফতর, পরিদফতর, ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশের আইনে নিবন্ধিত যে কোন প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, ফার্ম, ট্রাষ্ট, সোসাইটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, বেসরকারী সংস্থা সমিতি, সংগঠনের কাছে কোন তথ্য চাইলে তা ২০ দিনের মধ্যে দিতে হবে। জনগণ যাতে সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে তাদের ইনডেক্স ও ক্যাটালগ প্রস্তুত রাখতে হবে। তবে আবেদনকৃত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু কিংবা কারাগার থেকে মুক্তির বিষয় জড়িত থাকে তাহ'লে আবেদন লাভের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

এদিকে ১১ মার্চ এলজিইডি ভবনে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ-২০০৮ প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা উক্ত অধ্যাদেশকে গোঁজামিল ও অসঙ্গতিতে ভরা বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, এটি অনুমোদন হ'লে আইন থাকলেও তথ্য প্রাপ্তি থেকে জনগণ বঞ্চিত হবে। বিশেষ করে এর দ্বারা মিডিয়া কোনভাবেই উপকৃত হবে না।

ওয়েবসাইটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নিয়ে বাংলায় একটি ওয়েবসাইট প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এ সাইটে হাদীছে কুদসী সমূহ রাখা হয়েছে এবং আরো হাদীছ সংযোজন করা হচ্ছে। সাইটটির ঠিকানা- http:// hadithshareeforg

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী '০৮ বর্তমান তত্ত্বাবধায় সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮'-এর আওতায় নারীর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। ৮ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমাদ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাকারে এ নীতির মোড়ক উন্মোচন করেন। উক্ত প্রস্তাবে নারীর সমঅধিকারের নামে নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে, যা কুরআনিক আইনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আইনটি সূরা নিসার ৭, ১১-১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতের সরাসরি লংঘন।

নারীর সমঅধিকার প্রদানের নামে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে দেশের ধর্মপ্রাণ ইসলামী সংগঠন ও ওলামায়ে কেরাম ফুঁসে ওঠে। অবিলম্বে এ আইন বাতিলের দাবীতে মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পরিস্থিতি ঘোলাটে হ'লে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা এ.এফ হাসান আরিফ ১১ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে ওলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় শেষে বলেন, 'সরকার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়নি। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়নের মানসিকতা বর্তমান সরকারের নেই'। এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক সভায় সরকার কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন আইন করবেন না বলে জানান।

[দেশের আপামর মুসলিম জনতা আবারো প্রমাণ করল যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন তারা মেনে নিতে বাধ্য নয়। ইসলাম, কুরআন ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবমাননা যেমন বরদাশত করা হবে না, তেমনি কুরআনের বিধান পরিবর্তনের যেকোন অপচেষ্টাও প্রতিরোধ করা হবে। আলেম-ওলামা নির্যাতন, দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য এবং নিজেদের অন্যায় কর্মের কারণে এমনিতেই দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব উচ্চারিত হচ্ছে। সর্বত্র পড়েছে হাহাকার। নেমে আসছে একের পর এক গযব। তার উপর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআনের বিধান পরিবর্তনের ঔদ্ধত্য বাস্তবায়িত হ'লে এদেশের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। অতএব সময় থাকতেই তওবা করে ফিরে আসুন। -সম্পাদক]

বিবিসির বাংলা সংবাদ বাংলাদেশ বেতারে শোনা যাবে

বিবিসি'র বাংলা সংবাদ এখন থেকে ঢাকার বাইরে এফএম ব্যান্ডে বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলেও শোনা যাবে। এ ব্যাপারে গত ১৯ মার্চ বিবিসি ও বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিন বছর মেয়াদী এ চুক্তির ফলে আগামী ২০১১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতার প্রতিদিন বিবিসির বাংলা সংবাদ সকাল সাড়ে ৬-টা থেকে ৭-টা ও সাড়ে ৭-টা থেকে ৮-টা এবং রাত সাড়ে ৭-টা থেকে ৮-টা ও সাড়ে ১০-টা থেকে ১১-টা অবধি এফএম ব্যান্ডে চট্টগ্রাম ও রংপুরে ১০৫ দশমিক ৪ মেগাহার্জে, রাজশাহী ও সিলেটে ১০৫ মেগাহার্জে, খুলনায় ১০২ মেগাহার্জে ও কুমিল্লায় ১০১ দশমিক ২ মেগাহার্জে প্রচার করবে। বিবিসির সাথে বাংলাদেশ বেতারের অনুরূপ এক চুক্তির আওতায় ১৯৯৪ সাল থেকে বিবিসির অনুষ্ঠান এফএম ব্যান্ডে ১০০ মেগাহার্জে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় শ্রোতারা বর্তমানে প্রতিদিন সকাল ৬-টা হ'তে দুপুর ১২-টা এবং বিকেল ৫-টা হ'তে রাত ১১-টা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছেন।

ঢাকার বাইরের ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হ'তে সম্প্রচার সম্পর্কিত তিন বছর মেয়াদী নতুন এ চুক্তির আওতায় বিবিসি প্রতিবছর বাংলাদেশ বেতারকে ৬৫ লাখ টাকা ফি প্রদান করবে। এছাড়াও বেতারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। ঢাকার বাইরের এই ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের যেকোন একটিতে আগামী ২৬ মার্চ থেকে এবং অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলো হ'তে আগামী ১লা বৈশাখ থেকে বিবিসির বাংলা সংবাদ এফএম ব্যান্ডে শোনা যাবে।

বিশ্বের সেরা ধনী বাফেট

টানা ১৩ বছর বিশ্বের সেরা ধনী মাইক্রোসফটের বিল গেটস এবার ৩ নম্বরে নেমে এসেছেন। সে স্থান দখল করেছেন ৭৭ বছর বয়সী জনসেবক ও স্টক ব্যবসায়ী ওয়ারেন বাফেট। ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন 'ফার্বস' গত ৫ মার্চ এ বছরের বিশ্বের সেরা ধনী ও বিলিয়নিয়ারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সে তালিকায় দেশ হিসাবে তৃতীয় স্থান দখল করেছে ভারত। ভারতের ৫৩ জন বিলিয়নিয়ারদের মধ্যে ৪ জন রয়েছেন সেরা দশে। এবারো আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী ধনী মানুষের সংখ্যা প্রতীয়মান হয়েছে। সারাবিশ্বে ১১২৫ জন বিলিয়নিয়ারের মধ্যে ৪৬৯ জন হ'লেন আমেরিকান। গত বছর এ সংখ্যা ছিল সারাবিশ্বে ৯৪৬।

এবারের সেরা ধনীর আসন দখলকারী ওয়ারেন বাফেটের সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ৬৮ বিলিয়ন ডলার। দু'বছর আগে অর্থাৎ ২০০৬ সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৩ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় সেরা ধনী মেক্সিকোর টেলিফোন ব্যবসায়ী কার্লস স্লিম হেলোর সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ৬০ মিলিয়ন ডলার। আর বিল গেটসের সম্পদের পরিমাণ ৫৮ মিলিয়ন ডলার।।

[দুর্ভাগ্য যে, ধনীদের এই বিশাল তালিকায় গরীবদের আশ্বস্ত হবার কিছুই নেই। কেননা গরীবরা তাদের নির্ধারিত অংশ ধনীদের নিকট থেকে পান না। বিশ্বের সেরা ধনীরা কি পারেন না ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের সম্পদের শতকরা ২$^{১}/_{২}$ পার্সেন্ট করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবারের মুখে ফুটবে তৃপ্তির হাসি। অভুক্ত মানবতা পাবে এক মুঠো অন্ন। নচেৎ এই সম্পদই একদিন আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।-সম্পাদক]

ইরাক যুদ্ধের জন্য চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে ব্যয় হবে ১ হাযার ২শ' কোটি ডলার

যুদ্ধ কোন সভ্য জাতির কাম্য নয়। তবুও অনাকাঙ্ক্ষিত এই বাস্তবতার স্বীকার হয় মানুষ, মুখোমুখি হ'তে হয় এই ভয়াবহ কঠিন অবস্থার। তাতে জীবন দিতে হয় অগণিত লোককে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে সংশ্লিষ্ট দেশের উপর। ইরাক যুদ্ধ তেমনি এক ঘটনা। এতে একদিকে যেমন রক্ত ঝরছে, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে। ২০০৮ সালের এক নতুন সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ইরাক যুদ্ধে রক্তক্ষয়ের পরিমাণ হয়ত কমে আসছে কিন্তু অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই স্টিঘটিজ এবং সহ-লেখক লিন্ডা জে বিলমেস ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ ও সেখানকার সেরা ঘটনা ও বাস্তবভিত্তিক দৃশ্যপট নিয়ে লেখা তাদের নতুন বই 'বেয়ন্ড ২০০৮'-এ উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধের ষষ্ঠ বছরে ইরাকে প্রতি মাসে ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে আনুমানিক এক হাযার ২শ' কোটি মার্কিন ডলার। শুরুর বছরগুলোর তুলনায় এই হার প্রায় তিনগুণ বেশী। তারা উল্লেখ করেছেন, ইরাক ও আফগানে দীর্ঘস্থায়ী মার্কিন সামরিক দখলসহ সেখানকার যুদ্ধের কারণে মার্কিন বাজেট ২০১৭ সালের মধ্যে ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন থেকে ২ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার (১ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন থেকে ১ দশমিক সাত পাঁচ ট্রিলিয়ন ইউরো) কিংবা তার চেয়েও বেড়ে যাবে। তারা জানান, এসব ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থ ধার নেয়া হয়েছে তার সুদই কেবল গুনতে হবে অতিরিক্ত ৮১ হাযার ৬শ' কোটি ডলার।

[যুদ্ধবিলাসী দেশের এক মাসের যুদ্ধ ব্যয় অনেক দরিদ্র দেশের সারা বছরের বাজেটের প্রায় সমান। অন্যায় ও অসম যুদ্ধের পিছনে এই বিশাল অংকের অর্থ বরাদ্দ না করে যদি বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর সিকি অংশও ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লে সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র কোন বনু আদমকে আর না খেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হ'ত না। আর যুদ্ধের কারণে বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ও ঘটতো না। বরং সর্বত্র ফিরে আসতো শান্তি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি দিবেন কি? -সম্পাদক]

মরলে শাস্তি!

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সারপোরেংস গ্রামের মেয়র গ্রামবাসীকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'কারো মরা চলবে না, মরলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে'। গ্রামের একমাত্র কবরস্থানে আর কোন জায়গা না থাকায় মেয়র এই হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ ব্যাপারে একটি অধ্যাদেশও জারী করেন। গত জানুয়ারী মাসে পার্শ্ববর্তী পাউ শহরের একটি আদালত কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থান সংলগ্ন ব্যক্তিগত জমি দখল বেআইনি বলে রায় দেওয়ার পর মেয়র গেরার্দ লালানে দিশেহারা হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, অনেকে হয়তো আমার কথা শুনে হাসবেন। কিন্তু এটা আমার জন্য হাসির কোন বিষয় নয়।

[মেয়রের এই হুমকি যেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ তেমনি হাস্যকরও বটে। কেননা মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না একথা যেমন সত্য, তেমনি কার কখন, কোথায় মৃত্যু ঘটবে এ বিষয়ে কারও কোন জ্ঞান নেই। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার শক্তিও কারো নেই। এরূপ বক্তব্যের জন্য মেয়রের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তবে কবরস্থানে জায়গা না হ'লে এবং জায়গা বাড়ানো সম্ভব না হ'লে পুনরায় মাটি ভরাট করে তার উপর দাফন করা যাবে। -সম্পাদক]

১৩ টন বিরিয়ানি এক ডেকে!

নয়াদিল্লীর একদল বাবুর্চি ১৬ ফুট গভীর বিশালকায় এক ডেকচিতে রান্না করেছেন ১৩ টন বিরিয়ানি যা বর্তমান বিশ্বে এক নতুন রেকর্ড হবে বলে জানিয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। এই বিশ্বরেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে ভারতের ৬০ জন বাবুর্চি নয়াদিল্লীর স্পোর্টস স্টেডিয়ামে এ রান্নার আয়োজন করে। এজন্য বিশেষভাবে ইস্পাত দিয়ে তৈরী করা হয় বিশালকায় ডেকচি। যার গভীরতা ১৬ ফুট। তিন ফুট একটি চুলার ওপর ডেকচিটি বসিয়ে ক্রেনের সাহায্যে সেখানে ১২শ' লিটার তেল, ৩ হাযার কিলোগ্রাম বাসমতি

চাল, ৮৫ কিলোগ্রাম মরিচগুঁড়া, ৩ হাযার ৬৫০ কিলোগ্রাম সবজি, ১০ কিলোগ্রাম সুগন্ধি মশলা মিশিয়ে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় টাঙ্গি বিরিয়ানি রান্না করেন।

এই রান্নার আয়োজক গুরনাম অরোরা জানান, বিরিয়ানিতে যে এক চিমটে লবণ দেয়া হয়েছে, তার পরিমাণ প্রায় ৮৬ কিলোগ্রাম। হোস পাইপ দিয়ে ডেকচিতে পানি দেয়া হয়েছে ৬ হাযার লিটার। বাবুর্চিরা অগ্নিরোধাক পোশাক পরে ডেকচির চারপাশে বেষ্টিত প্লাটফর্মে চড়ে নৌকার দাঁড়ের সমান খুন্তি দিয়ে নেড়ে নেড়ে এই বিরিয়ানি রান্না করেন। রান্না শেষে গাজর এবং সাড়ে ৭শ' কেজি দই দিয়ে এই ১৩ টন ওযনের বিরিয়ানি ডিশটিকে সাজানো হয়। প্রস্তুতি এবং রান্নাবান্না শেষ হ'তে সময় লাগে ১০ ঘণ্টা।

যুক্তরাষ্ট্রে আরেকজন মুসলমান কংগ্রেসে নির্বাচিত

ইন্ডিয়ান ভোটাররা ১১ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসে একজন মুসলমানকে নির্বাচিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো একজন মুসলিম কংগ্রেসম্যান নির্বাচিত হ'লেন। নির্বাচিত এন্ড্র কার্সন মৃত ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি জুলিয়া কার্সনের নাতি। জুলিয়া কার্সনের মেয়াদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এন্ড্রু বিশেষ নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। জুলিয়া কার্সন ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে মারা যান। তিনি ১১ বছর ডেমোক্র্যাট প্রভাবিত এ অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন।

ইন্ডিয়ানাপোলিস সিটি কাউন্সিলের সদস্য এন্ড্রু কার্সন (৩৩) একদশক আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ২০০৮ সালের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দাদীর বাকী মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মিলেসোটা থেকে প্রথম একজন মুসলিম কংগ্রেসম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার নাম কেইথ এলিসন। তিনিও ডেমোক্র্যাট দলের।

যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সদস্য হ'তে পারলে সহজেই ধনী হওয়া যায়

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য এবং উচ্চ পরিষদের সিনেটর নির্বাচিত হ'তে পারলে আর পায় কে? খুব সহজেই অর্থ ও বিত্তের মালিক হওয়া যায়। সাধারণ আমেরিকানরা যেভাবে তাদের আয়-রোযগার করে থাকে তার চেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেন কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরগণ। এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে অধিকাংশ আমেরিকানের তুলনায় কংগ্রেসম্যান ও সিনেটররা অনেক বেশী বিত্ত ও বৈভবের অধিকারী হয়েছেন। 'সেন্টার ফর রেসপন্সিভ পলিটিক্স' ওয়াশিংটনের একটি ওয়াচডগ গোষ্ঠী। এটি সরকারের উপর অর্থের প্রভাবের বিষয়টি তদারকি করে থাকে। এই সংস্থাটি গবেষণাটি পরিচালনা করে।

গবেষণায় বলা হয়, সিনেটরদের গড় আয় হচ্ছে ১৭ লাখ ডলার এবং কংগ্রেসম্যানের গড় আয় হ'ল পৌনে সাত লাখ ডলার। কংগ্রেস সদস্যরা বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাযার ডলার বেতন পাচ্ছেন। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালে তাদের নীট আয় গড়পড়তায় ৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেসের সবচেয়ে ধনী সদস্য হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি জেনি হ্যারম্যান। তার নীট সম্পদের মূল্য হচ্ছে ৪০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সেন্টার জানায়, ৫৮ ভাগ সিনেটর এবং প্রতিনিধি পরিষদের ৪৪ ভাগ সদস্য কোটিপতি। রিপোর্টে বলা হয়, কংগ্রেসের ১০০ সদস্য জেনারেল ইলেকট্রিকের শেয়ার মালিক, ৭০ জন মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের শেয়ারের মালিক, ৬৯ জন ফাইজার কোম্পানীর শেয়ারের মালিক, ৬৯ জন সিস্কো সিস্টেমের শেয়ার মালিক, ৬৫ জন ইন্টেল কর্পোরেশনের শেয়ার মালিক এবং ৬১ জন এক্রোন মোবাইলের শেয়ার মালিক।

হু জিনতাও পুনরায় চীনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

চীনের পার্লামেন্ট আগামী ৫ বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে হু জিনতাওকে সে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করেছে। এছাড়া ঝি জিনপিংকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে। গত ১৫ মার্চ চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত ভোটে বড় ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওকে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। এ সময় ৬৫ বছর বয়সী কমিউনিষ্ট নেতা হু জিনতাও পার্লামেন্ট ডেলিগেটের ২ হাযার ৯৬৫ ভোটের মধ্যে ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন লাভ করেন।

কাঠের বাক্সে কোটি কোটি ডলার!

জাপানের দুই বোন মিলে কাঠের বাক্সে ৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার জমিয়ে রেখেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা কর ফাঁকি দেয়ার জন্যই এভাবে ডলার জমিয়ে রেখেছে। সম্ভবত জাপানে এটাই সবচেয়ে বড় কর ফাঁকি দেয়ার ঘটনা বলে জানিয়েছে জাপানী গণমাধ্যম। ১২ মার্চ জাপানের ইংরেজী সংবাদপত্র ইয়ুমিউরি জানিয়েছে, পুলিশ জাপানের পশ্চিমাঞ্চলের শহর ওসাকা থেকে এ দুই বোনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের নাম হাতসু শিমিজু (৬৪) এবং ইয়ুশিকো আইশি (৫৫)। দুই বোন তাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইয়েন লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের বাবা একজন রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারী ছিলেন।

মুসলিম জাহান

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন

ইসলামভীতি পরিহার করতে পাশ্চাত্যের প্রতি আহ্বান

ইসলামভীতি পরিহার করে বিশ্বশান্তির জন্য একতাবদ্ধ হ'তে পাশ্চাত্যের প্রতি আহ্বানের মধ্য দিয়ে গত ১৪ মার্চ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে শেষ হয়েছে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র (ওআইসি) ১১তম শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে সূদান ও শাদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ফিলিস্তীন সমস্যার সমাধানে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি ইসরাঈলী আগ্রাসন ও উপসাগরে মার্কিন দখলদারিত্বেরও কঠোর সমালোচনা করা হয়।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রধান দেশ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনে এই প্রথম মার্কিন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এখনো জাতিসংঘের স্বীকৃতি না পেলেও অতি সম্প্রতি স্বাধীনতা ঘোষণাকারী নতুন বলকান রাষ্ট্র কসোভোও সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।

১৩ মার্চ ডাকারের মেরিডিয়ান প্রেসিডেনসিয়াল হোটেলে প্রাথমিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ার সিনেট সভাপতি পান্ট মুহাম্মাদ হামীদ পাওয়াস্থ। এর আগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে অধিবেশন শুরু করেন ডাকারের নসরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের শেখ টিডিয়ানে এন্ডঙ্গো। এবারের সম্মেলনে পাশ্চাত্যের অহেতুক ইসলামভীতি নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পায়। বক্তারা বলেন, পাশ্চাত্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে অহেতুক ইসলামভীতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এই ভুল বোঝাবুঝিই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে পাশ্চাত্যকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে একযোগে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করতে হবে। ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যে কোন সম্পর্ক নেই তাও সম্মেলনে বক্তারা তুলে ধরেছেন।

সম্মেলনে পাঁচ পৃষ্ঠার ডাকার ঘোষণায় মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এই উদ্দেশ্যে আল-কুদস সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্মেলনে ইসলাম ও মহানবী (ছাঃ)-এর অসম্মানকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাদাবীর শপথ গ্রহণ

মালয়েশিয়ায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবী গত ১০ মার্চ শপথগ্রহণ করেছেন। রাজধানী কুয়ালালামপুরে দেশটির সাংবিধানিক রাজা মীযান জয়নাল আবেদীনের সামনে রাজপ্রাসাদে স্থানীয় সময় বেলা ১১-টায় প্রচলিত কায়দায় বর্ণাঢ্য শপথপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ মার্চের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জোট আশানুরূপ ফল অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর বিরোধী দল তার পতদ্যাগ দাবী করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্লামেন্টের অর্ধেকের বেশী আসন লাভ করলেও এবারই প্রথম তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী জোটের এবারকার ফলাফলে দেশটির রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন মেরুকরণ ঘটেছে। সেদেশের ১৩টি প্রদেশের মধ্যে পাঁচটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় বিরোধীদলীয় ইসলামপন্থী ও সংস্কারবাদীরা। বিরোধী জোট পার্লামেন্টের ২২২ আসনের মধ্যে ৮২টি আসন দখল করে গতানুগতিক রাজনৈতিক আধিপত্যের ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছে।

মালয়েশিয়ায় নয়া মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণঃ মালয়েশিয়ায় একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন হয়েছে। এই মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবী। মন্ত্রীসভায় রয়েছেন মোট ৬৯ জন সদস্য। গত ১৯ মার্চ কুয়ালালামপুরের রাজপ্রাসাদে তাদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। সেদেশের রাজা মীযান যায়নুল আবেদীন সপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

তেল শোধনাগার নির্মাণে ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও মালয়েশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর

যৌথ অংশীদারিত্বে প্রায় ৬শ' কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি তেল শোধনাগার নির্মাণ করতে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও মালয়েশিয়া। এ লক্ষ্যে গত ১২ মার্চ তারা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশটির ইংরেজী দৈনিক 'দ্য জাকার্তা পোষ্ট' জানায়, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানী পিটি পেট্রামিনা বালতেন প্রদেশে একটি বৃহৎ তেল শোধনাগার স্থাপনে ইরান ও মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এ প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ বিলিয়ন বা ৬শ' কোটি মার্কিন ডলার। শর্ত মোতাবেক সকল পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের ২ সপ্তাহের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় একটি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব তারা এ প্রকল্পের কাজ শুরু করবে। প্রকল্পটির কাজ ২০২২ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইরাকে উদ্বাস্তু সংকট শোচনীয় হচ্ছে

ইরাকে উদ্বাস্তু সংকট ক্রমেই বাড়ছে। যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়া লাখ লাখ ইরাকীর জীবনযাত্রার মান,

আশ্রয়ের অভাব ও খাদ্য সংকটের কারণে হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। উদ্বাস্তু বিশেষজ্ঞরা হোয়াইট হাউস সাব কমিটির শুনানিকালে বলেছেন, ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার পাঁচ বছর পর দেশটির অভ্যন্তরেই গৃহহীন হয়ে পড়া ২৫ লাখ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে যাওয়া ২০ লাখ শরণার্থী গভীর সংকটে শোচনীয় দিন কাটাচ্ছে। ইউএসএইডের ব্যুরো ফর ডেমোক্র্যাসির ডেপুটি সহকারী প্রশাসক গ্রেগরি গটলিয়েভ বলেন, সহিংসতা হ্রাস, গৃহহীনের হার কমে আসা এবং ২০০৭ সালে সীমিতসংখ্যক শরণার্থী দেশে ফিরলেও ইরাকে এখনও গৃহহীন হয়ে পড়া লোকজন মারাত্মক মানবিক সংকটের মধ্যে রয়েছে।

সূদান-শাদ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

সূদান ও শাদের মধ্যকার পাঁচ বছরের বৈরীতা অবসানের লক্ষ্যে দুই দেশের প্রেসিডেন্ট গত ১৩ মার্চ একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুন এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। শাদের প্রেসিডেন্ট ইদরীস দুবে ও সূদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীর সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ইতিপূর্বে ব্যর্থ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মত হন। এর আগে এই দুই প্রতিবেশী দেশ তাদের নিজ নিজ সরকারকে উৎখাতের চেষ্টায় নিয়োজিত বিদ্রোহীদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায়ই একে অপরকে দোষারোপ করত। এই দুই নেতার বৈঠকে মিলিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও শাদ সীমান্তে তার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের জন্য ভারী অস্ত্র পাঠানোর জন্য সূদানকে দায়ী করে। সেনেগালের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লায়েভ ওয়াদে এর মধ্যস্থতায় ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'ডাকার চুক্তি' নামে সুপরিচিত এই চুক্তির আওতায় উভয় দেশ পূর্বের ব্যর্থ এই চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মত হয়। এতে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ গ্রুপ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। তারা কেউ চুক্তি লংঘন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য এই গ্রুপ প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

পাকিস্তানে নতুন পার্লামেন্টের যাত্রা শুরু

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গত ১৭ মার্চ ইসলামাবাদে পার্লামেন্ট হাউসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল নতুন পার্লামেন্টের। এরপর ৩২৮ এমপিকে শপথবাক্য পাঠ করান বিদায়ী স্পীকার চৌধুরী আমীর হুসাইন। শপথ গ্রহণ শেষে এমপিরা আক্ষরিক ক্রমানুসারে রোল বুকে সই করেন। এবারে এমপিরা সংশোধিত সংবিধানের পরিবর্তে ২০০৭ সালের ৩ নভেম্বরের আগের সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করেন। কারণ ঐ তারিখে প্রেসিডেন্ট মোশাররফ যরূরী অবস্থা জারী করে সংবিধান স্থগিত করে তা সংশোধন করেছিলেন। শপথ গ্রহণের আগেই এমপিরা মোশাররফের সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী শপথ করবেন না বলে জানালে স্পীকার আগের সংবিধান অনুযায়ী তাদের শপথ করান।

এদিকে দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন পিপিপির ইউসুফ রাজা জিলানী। গত ২৪ মার্চ পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতে ৩৪২ আসনের পার্লামেন্টের তিনি পেয়েছেন ২৬৪ ভোট। আর তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী চৌধুরী পারভেজ ইলাহী পেয়েছেন মাত্র ৪২ ভোট।

ফাহমিদা মির্জা প্রথম মহিলা স্পীকারঃ

পাকিস্তানে গত ১৯ মার্চ স্পীকার হিসাবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেত্রী ফাহমিদা মির্জা শপথ গ্রহণ করেছেন। ১৬ কোটি মানুষের এ দেশটিতে বিগত ৬০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোন মহিলা স্পীকার হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। এর আগে ঐ দিন জাতীয় পরিষদের স্পীকার পদে নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হয় এবং তিনি বিশাল ব্যবধানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন। পিপিপির নেতৃত্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এন, আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি এবং জামা'আত ওলামা-ই-ইসলাম নিয়ে গঠিত জোটের প্রার্থী হিসাবে তিনি স্পীকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ জোট গত ১৮ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে ৩৪২ আসনের পার্লামেন্টে ২২৫ আসন লাভ করলেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেননি। ফাহমিদা প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ কিউ এবং কোয়ালিশন প্রার্থী ইশরার তারিনকে পরাজিত করেছেন। ফাহমিদা পেয়েছেন ২৪৯ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইমরান তারিন পেয়েছেন ৭০ ভোট।

উল্লেখ্য, ফাহমিদার স্বামী জুলফিকার মির্জা বেনজির ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলী জারদারির ঘনিষ্ট সহচর ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে পিপিপির নির্বাচিত সদস্য।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এন্টি ডায়াবেটিক টি

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য হারবাল এন্টি ডায়াবেটিক টি আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা। 'ডায়াবিনো' নামের এ চা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করবে। একই সাথে শরীর থেকে ইনসুলিন নিঃসরণে সাহায্য করবে। এছাড়া জারুল গাছের পাতা থেকে তৈরী এ চা মেদ কমানো ও তারুণ্য দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। গত ৫ মার্চ 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (বিসিএসআইআর) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। দেশের পাঁচজন বিজ্ঞানী বিসিএসআইআরের চট্টগ্রাম গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এই হারবাল এন্টি ডায়াবেটিক টি আবিষ্কার করেছে। প্রাণীর দেহে হারবালটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়েছে। যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ হারবাল টিতে ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। দেশে মানুষের দেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা সম্ভব না হ'লেও বিদেশে করা হয়েছে। সেখানেও সফলতা পেয়েছে এই হারবাল। এই চা বাজারজাত করার জন্য বিসিএসআইআর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ফেস ফার্মাসিউটিক্যাল। দেশের সকল প্রান্তেই এ চা পাওয়া যাবে।

মদ খেলে দুঃখস্মৃতি দূর হয় না আরো জেঁকে বসে

যুগে যুগে মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে, মদ খেলে দুঃখ ভুলে থাকা যায়। কিন্তু জাপানী গবেষকদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আসলে মদ খেলে মন্দ স্মৃতিগুলো আরো বেশী প্রলম্বিত হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এলকোহল বা মদে ইথানল নামের যে মাদকদ্রব্য থাকে তাতে স্মৃতিশক্তি কমে না; বরং তা স্মৃতিগুলোকে মস্তিষ্ককোষে আরো শক্তভাবে গেঁথে দেয়। ওষুধ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর নোরিদ মাটসুকি গবেষণাগারে রক্ষিত ইঁদুরের মধ্যে ভয় সৃষ্টির জন্য মৃদু শক বা আঘাত সঞ্চার করেন। ফলে ইঁদুর আতঙ্কে জড়োসড় হয়ে যায় এবং তাদের খাঁচায় থাকার সময় কুঞ্চিত হয়ে যায়। এর পরপরই গবেষকরা ইঁদুরের দেহে ইথানল কিংবা স্যালাই ইনজেকশন পুশ করেন।

গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, শিরায় এলকোহল সমৃদ্ধ ইঁদুরের মধ্যে সেই ভয় গড়ে অন্তত দুই সপ্তাহ বলবৎ আছে। ইনজেকশন পুশ করা হয়নি এমন ইঁদুরের সাথে তুলনা করে এটা দেখা যায়। গবেষণায় বলা হয়, এই প্রক্রিয়া যদি আমরা মানবদেহে প্রয়োগ করি তাহ'লে দেখা যাবে যে স্মৃতি থেকে বাঁচার জন্য তারা মদ খাচ্ছে সেই স্মৃতি আরো শক্তভাবে তাদের ঘিরে ধরেছে। তারা তাদের অপছন্দের স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য মদ খেলে এবং কিছু সময় ফুর্তিতে কাটালেও সেই স্মৃতি তাদের মাঝে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। গবেষণায় বলা হয়, পরদিন তাদের মনেও থাকে না যে, গতকাল কিছু সময় তারা প্রফুল্ল ছিল।

দিবানিদ্রা স্মৃতিশক্তি বাড়ায়

দৈনন্দিন জীবনে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ঘুম অপরিহার্য। সাধারণত মস্তিষ্ককে বিশ্রামে রাখা রাতের বেলা ঘুমের প্রধান কাজ। কিন্তু অনেক সময় মস্তিষ্ককে সবল রাখতে বিশেষ করে উদ্দীপ্ত করতে ঘুমের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন- দিবানিদ্রা। এতে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি জার্মান বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, দিনের বেলা মাত্র ছয় মিনিটের শর্ট স্লিপ মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। স্মৃতিশক্তি এবং ঘুমের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। ঘুম এবং জেগে ওঠার প্রাত্যহিক চক্রের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জার্মানীর ডুসেলর্ডফ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা পরীক্ষা করেছেন কত কম ঘুম স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা একদল ছাত্রকে কতগুলো শব্দ পাঠ করান। তারপর তাদের দু'দলে ভাগ করে একদলকে ছয় মিনিট ঘুমানোর সুযোগ দেন এবং অপরদলকে জাগ্রত রাখা হয়। পরে উভয় দলকে একসঙ্গে মেমোরি টেস্টে পরীক্ষা করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল যারা মাত্র ছয় মিনিট দিবানিদ্রায় ছিলেন তারাই ভাল ফলাফল করেছেন।

ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যাঙের চামড়ার রস!

ব্যাঙের চামড়ার রস দিয়ে ডায়াবেটিস চিকিৎসার এক চমকপ্রদ খবর জানিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ আমেরিকার শ্রিংকিং ফ্রগ নামের এক জাতের ক্ষুদে ব্যাঙের চামড়া থেকে নিঃসরিত রসের রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে টাইপ টু ধরনের ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সম্ভব বলে মত দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই ব্যাঙের চামড়া থেকে সংগৃহীত উপাদান দেহে ইনসুলিনকে উজ্জীবিত করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এই রসের কৃত্রিম উপাদান সিউডিন-২ ব্যবহার করে ডায়াবেটিসের বিভিন্ন ওষুধ তৈরির চিন্তাভাবনা করছেন। মানবদেহে পর্যাপ্ত ইনুসলিন উৎপন্ন না হ'লে কিংবা ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হ'লে টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় মানুষ। অনেক সময় অতিরিক্ত ওযনকে এই ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী করা হয়। ব্রিটেনের আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরব আমীরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন, শ্রিংকিং ফ্রগের চামড়ার রসে সিউডিন-২ উপাদান তাদের ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করে। এখন সেই উপাদান ব্যবহার করে মানুষের ডায়াবেটিস সারাবার চিন্তা করছেন তারা।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

দুর্বাডাঙ্গা, যশোর ১৮ মার্চ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে মনিরামপুর থানার অন্তর্গত দুর্বাডাঙ্গা বি.ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

বাগেরহাট, ১৯ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে স্থানীয় রাজপাট (কুল্লা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও নতুন ঘোষগাতি সিনিয়র মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, উদয়পুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইদরীস আলী, আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া, বাগেরহাটের পরিচালক মাওলানা যুবাইর, মাওলানা আব্দুল আহাদ (ফরিদপুর) প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানব রচিত কোন দল ও তরীকার নাম নয়, এটা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহীভিত্তিক আন্দোলনের নাম। আর অহী-র নিঃশর্ত অনুসারীদেরকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। তিনি সবাইকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে শরীক হয়ে আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি দীর্ঘ তিন বছর যাবত মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মুক্তির জোর দাবী জানান।

সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা ১৯ ও ২০ মার্চ বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানার সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে সোনাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ১৯ ও ২০ মার্চ ২ দিন ব্যাপী এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বাদ আছর খুলনা যেলার পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে প্রথম দিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আনেদালন'-এর সভাপতি ও নগরঘাটা আলিম মাদরাসার আরবী প্রভাষক আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও গোদাঘাটা দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, ৬নং সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব এস.এম. শহীদুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসাইন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

হাসাডাঙ্গা, যশোর ২১ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় হাসাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ ও মাওলানা আব্দুল মালেক, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, দফতর সম্পাদক আব্দুছ

ছামাদ প্রমুখ। সমাবেশে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে যখন মানুষের মৌলিক মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন এসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দেশের বৃহৎ মুসলিম জনগণের ঈমান-আক্বীদায় কুঠারাঘাত হেনে সম্পদে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নামে কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে একটি মহল। তাদের এ অপচেষ্টা এদেশের তাওহীদী জনতা সফল হ'তে দেবে না। তিনি আরো বলেন, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ সৃষ্টিতে মদদ দানকারী শিক্ষকদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও সরকার সে সকল শিক্ষককে মুক্তি দিয়েছে। অথচ বিনা অপরাধে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কারাভোগ করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রবীণ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তাঁকে জামিন পর্যন্তও দেওয়া হচ্ছে না। অপরাধীরা মুক্তি পেলে একজন নিরপরাধ শিক্ষক কেন মুক্তি পাবেন না? তিনি অবিলম্বে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র শাখা দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল।

বংশাল, ঢাকা ২১ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় ঢাকার নাজিরা বাজারস্থ মাজেদ সরদার রোডে নাজিরা বাজার ও বাংলাদুয়ার এলাকাবাসীর উদ্যোগে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, এটি,এন বাংলার ভাষ্যকার হাফেয আব্দুছ ছামাদ মাদানী, সঊদী দূতাবাসের দাঈ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ প্রমুখ।

বক্তাগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁরা মীলাদুন্নবীকে ঈদ গণ্য করার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রটনাকারীদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বক্তাগণ ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় কারাবদ্ধ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২রা মার্চ রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার কমরগ্রাম এলাকার উদ্যোগে কমরগ্রাম উত্তর পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। কমরগ্রাম আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুস্তাফা হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান ও হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং কমরগ্রাম শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ ফিরোজ হোসাইন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাল ও যঈফ হাদীছ সমস্ত মুসলিম মিল্লাতের মাঝে কলহ-কোন্দল সৃষ্টি করছে ও মুসলমানদেরকে অসংখ্য দল ও মাযহাবে বিভক্ত করেছে। তিনি জাল বা বানাওয়াট হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কুরআন-হাদীছের ভুল ও অপব্যাখ্যা করে তরুণদেরকে জঙ্গীবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। যার খেসারত আজও আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আজও কারাবন্দী আছেন। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের পরও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে নস্যাত করার জন্য উক্ত ডাহা মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুলম ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, নিরপরাধ আলেম-ওলামার উপর নির্যাতন বন্ধ না হ'লে একের পর এক গযবে এই দেশ ধ্বংস হবে। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অজ্ঞতা

জ্ঞানের অভাব বা শিক্ষার অভাবকেই আমরা সাধারণত অজ্ঞতা বলে বুঝে থাকি। আবার ন্যায়-অন্যায় বুঝেও যারা অন্যায় করে বসে তাকেও অজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়। ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞান হওয়ার পর আমরা প্রাথমিকভাবে সকলেই কালিমা ত্বাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই' পাঠ করে আল্লাহ্র তাওহীদকে দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করে থাকি। পরিপক্ক জ্ঞান লাভ ও সচেতনতার সাথে সাথে আমরা জেনে বুঝে কালিমা শাহাদাত 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' পাঠ করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করি। এক্ষণে ইসলামে প্রবেশ করার পর আমাদের কর্তব্য কী হওয়া উচিত বা কী করা উচিত তা আমাদের জানতে হবে। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে দুনিয়াতে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। ঐ সমস্ত নিয়ম-নীতি পালন করলে মৃত্যু পরবর্তী হাশরের বিচারে উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত লাভ করা যাবে। আর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-নীতি লংঘন করলে শেষ বিচারে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মনীতি জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতঃ তা মুসলিমদের নিকট পেশ করেছেন এবং যথাযথভাবে তা পালন করে দেখিয়েছেন ও বলে গিয়েছেন। এই শিক্ষাদানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কার্পণ্য বা খেয়ানত করেননি; অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবেই তাঁর উম্মতের কাছে উপস্থাপন করে গেছেন। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নে'মত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ কী তাও আমাদের বলে দিচ্ছেন যে, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে' *(আহযাব ২১)*। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলে দিকভ্রান্ত হব না। তাঁর জীবন চরিত ও ছহীহ হাদীছ পাঠ করলে আমরা সবকিছুই জানতে পারব, জান্নাতের হকদারও হ'তে পারব। যদি তা না করি তবে তার চাইতে অজ্ঞতা আর কী হ'তে পারে! রাসূলের আনুগত্য না করলে জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত। আর জাহান্নাম যে অত্যন্ত কঠিন শাস্তির জায়গা এটা একজন বিধর্মীও বুঝে। এই চরম সত্যটিকে স্বতঃসিদ্ধভাবে উপলব্ধির পরেও অনন্তকাল শাস্তি ভোগের পথে চলাই হচ্ছে নির্ভেজাল অজ্ঞতা। অথচ মহান আল্লাহ মানুষকে ভালবেসে প্রথমতঃ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩১)*।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং রাসূলের। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে জেনে রেখো আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩২)*।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে আমাদের জীবন চলার পথের ধর্মীয় দিক নির্দেশনা খুঁজে পাই। মহান আল্লাহ যেমন মানুষকে ভালবেসে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি ভালবাসবেন, পাপ মার্জনা করবেন, কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অনুরূপভাবে তাঁর নির্দেশনা অমান্য করলে বা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মানুষ কাফির হয়ে যাবে। পরিণামে অনন্তকালের জন্য জাহান্নাম নিক্ষিপ্ত হবে। এই বাণীর মর্মার্থ বুঝার পরেও মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে শরী'আতের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হচ্ছে। আর এজন্য দায়ী এক শ্রেণীর তথাকথিত পেটপূজারী অজ্ঞ মৌলভী, পীর-মাশায়েখ। তাদের কারনে দিন দিন বেড়ে চলেছে তথাকথিত অজ্ঞ মুসলমানের সংখ্যা। অথচ মহান আল্লাহ সতর্ক করে আমাদের বলে দিচ্ছেন, 'আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

আল্লাহ্র এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে অনেকে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করে। কী অদ্ভুত অজ্ঞতা! মানুষ বিভিন্ন মাযহাব, পথ ও মত তৈরী করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করেননি বা করতে বলেননি তা করে চলেছে এবং তারপরেও তারা নিজেদের মুসলমান ও রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করছে। বাস্তবতার নিরিখে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে বদর যুদ্ধে কাফিরদের

মোকাবেলা করেছেন; যুদ্ধে জয়ী হ'লেও বেশ কিছু ছাহাবী সেখানে শহীদ হয়েছেন; সেজন্য কি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) জীবিত ছাহাবীগণকে নিয়ে শহীদ ছাহাবীগণের কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন বা কাফিরদের ন্যায় দেব-দেবী নির্মাণ করে সেখানে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছেন? কিংবা শহীদগণের বাড়ী বাড়ী গিয়ে মীলাদ-মাহফিল, চল্লিশা উদযাপন করেছেন? তাদের জীবদ্দশায় কি ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হয়েছে? যদি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কিংবা ছাহাবীগণ সেরূপ কোন অনুষ্ঠান করে না থাকেন, তবে এদেশে তথাকথিত মুসলমানেরা কেন পূণ্যের আশায় এরূপ বিদ'আতী অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রচলন করে চলেছে? আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কী ইসলামী শরী'আত সম্বন্ধে বেশী জানতেন, না বর্তমান যুগের কথিত মৌলভী ও ভণ্ড পীরেরা বেশী জানে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কী শবেবরাত নামের কোন অনুষ্ঠানের প্রচলন করে হালুয়ারুটি খাওয়া দাওয়া ও বিলি বন্টন করার ব্যবস্থা করে গেছেন? যদি তা না করে থাকেন তবে আমরা নেকী লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিদ'আত পালন করে চললে আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসারী উম্মত বলা যাবে কি? আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পাব কি? তাই আসুন আমরা এই বিদ'আতরূপ নির্ভেজাল অজ্ঞতা পরিহার করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অজ্ঞতা দূর করুন।- আমীন!!

** মাযহারুল হান্নান*
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, রাজশাহী।

বিসিএসে সংরক্ষিত কোটার যৌক্তিকতা

আমরা জানি বিশ্বায়নের এ যুগে টিকে থাকতে হ'লে প্রতিযোগিতার কোন বিকল্প নেই। আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বেরিয়ে আসবে প্রকৃত মেধাবী। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু বাংলাদেশে বিসিএস-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সংরক্ষিত কোটা প্রথা চালু করে প্রকৃত মেধাবীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন করে দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সমাজে বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া অংশকে আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য কোটা প্রথা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কিন্তু এমন কোন দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে মুক্ত প্রতিযোগিতার চেয়ে কোটার অনুপাত বেশী। অথচ একটি মাত্র আজব দেশ এর ব্যতিক্রম যা কিনা আমাদেরই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ!

বিসিএসে সংরক্ষিত কোটার পরিমাণ ৫৫ শতাংশ। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, উপজাতীদের জন্য ৫ শতাংশ এবং জেলা কোটা ১০ শতাংশ যা বাংলাদেশের সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। কারণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ ধারার ১ উপধারায় বলা আছে 'সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে'। ২৯ ধারার ১ উপধারায় বলা আছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে'। ২ উপধারায় আছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না'। অথচ বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যারা মোট আবেদনকারীর ১ শতাংশও নয় তাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

এক জরিপ হতে জানা যায়, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মাত্র .০৬ শতাংশ। অথচ তাদেরকে ৩০ শতাংশ কোটা দেয়ার ফলে তারা সাধারণ প্রার্থীদের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশী সুবিধা ভোগ করছে, যা চরম বৈষম্য বৈকি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছিলেন বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়ার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, বিসিএস বা সরকারী চাকুরীতে কোটা পাওয়ার জন্য নয়। যা হামিদুল হোসেন তারেক বীরবিক্রম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞানের অধ্যাপক মুক্তিযোদ্ধা ড.নাজমা শাহীন-এর ভাষ্য থেকে জানা যায়। হামিদুল হোসেন তারেক বীরবিক্রম বলেন, 'একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কখনোই সার্টিফিকেটের পরোয়া করেন না। মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য, দেশ স্বাধীন হলে বিসিএসের কোটায় সন্তান চাকরী পাবে এ প্রত্যাশায় কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেননি' *(দৈনিক সমকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৮,পৃ: ৪)*। মুক্তিযোদ্ধা ড.নাজমা শাহীনও ঠিক একই কথা বলেছেন। আর সেজন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শামীমের মত মুক্তিযোদ্ধার সুযোগ্য সন্তানদেরকে আজ প্রকাশ্য ময়দানে বলতে শোনা যায়- 'আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার ছেলে হওয়া সত্বেও আমি এ বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতিকে ঘৃণা করি। এর দ্বারা প্রকৃত মেধাবীদেরকে বঞ্চিত করে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে'।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক এক সমাবেশে বলেছেন,'...মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কারো করুণার পাত্র নয়'। তাঁর এ কথার সাথে আমি শতভাগ একমত এজন্য যে, আমার জানা মতে কোন মুক্তিযোদ্ধাই কারো করুণা পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করেননি। বিসিএস সহ সকল সরকারী চাকুরীতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রেখে প্রকারান্তরে তাদেরকে অযোগ্য ও মেধাহীন হিসাবে প্রমাণ করে কোটার মাধ্যমে

নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এটা কি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন নয়? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, দেশমাতৃকার স্বাধীকার আন্দোলনের বীর সেনানী। আর সে জন্যই কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কি পারে কোন অন্যায়, অনিয়ম, বঞ্চনা-বৈষম্যকে সমর্থন করতে? অবশ্যই না। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চিন্তা করা দরকার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশে বিসিএসে কোটা প্রথা বাতিল বা সংস্কারের যে দাবি উঠেছে তা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। সাথে সাথে এ বিষয়েও সজাগ থাকতে হবে যে, কোন অসাধু, দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষী মহল কোটা সংস্কারের এই আন্দোলনকে 'মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষ' হিসাবে উল্লেখ করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তাদের হীন স্বার্থ যেন হাছিল করতে না পারে।

এ দেশে উপজাতির সংখ্যা .৫ শতাংশেরও কম। বিসিএসে তাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা ৫ শতাংশ। ফলে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ৯০ গুণ বেশী সুবিধা ভোগ করছে। অপরদিকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে । অথচ বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছেলে-মেয়ের আনুপাতিক হার প্রায় সমান। এর পরও শুধু মেয়ে হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তাদের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ আসন বরাদ্দ রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক নয় কি? তবে হ্যাঁ, এ বিষয়ে আজ মেয়েরাও বেশ সচেতন বলতে হয়। কারণ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসিএসে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবীতে অনুষ্ঠিত এক মানব বন্ধনে জনৈকা ছাত্রীর গলায় এক প্ল্যাকার্ডে শোভা পাচ্ছিল 'বিসিএস স্বামী চাই, কোটায় হলে দরকার নাই'-এর মত শ্লোগান। এ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে স্বয়ং নারীরাও আজ এ বৈষম্যমূলক কোটার বিরোধী। এছাড়া ১০ শতাংশ জেলা কোটাও সংবিধানের ২৯ ধারার ২ উপধারার সুস্পষ্ট লংঘন।

সুতরাং বিসিএস-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সংরক্ষিত কোটা প্রথা যদি বাতিল বা সংস্কার করা না হয় তাহলে বলতে হয় যে, এতটা অংশ যদি কোটায় চলে যায় তাহলে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাইয়ের প্রয়োজন কি? বিসিএস সহ সরকারী চাকরীর ১০০ শতাংশই সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দিলেই বরং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে বিসিএসে ৫৫ শতাংশ কোটার পক্ষে যৌক্তিক কোন কারণ স্বয়ং পিএসসির চেয়ারম্যান ড. সা'দত হোসাইনও দিতে পারেননি। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৮ ডেইলি স্টার ভবনে সাপ্তাহিক ২০০০ ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এডিডি আয়োজিত "বিসিএস পরীক্ষায় কোটা যৌক্তিকীকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার" শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমাদের (পিএসসি) সংবিধান তৈরির আগেই কোটা চালু হয়ে গেছে। কোটার ব্যাপারে কোন আইন নেই। কোটা ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই'। তাঁর মতে, বলবৎ কোটাগুলোর ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেই বরং ভালো হবে। টিআইবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, 'প্রতিটি কোটা বাস্তবায়নের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা উচিত'। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারূক বলেন, 'কোন কোটাই অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না'। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে, আর মহিলা কোটা দীর্ঘদিন রাখারও কোন যৌক্তিকতা নেই'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানদের জন্য যে কোটা এমনটি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। তবে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ কোটা শতকরা ৫ ভাগ রাখা যেতে পারে'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র সহ দেশের সকল বিজ্ঞ মহলের দাবি বিসিএসে সংরক্ষিত কোটা বাতিল বা সংস্কার করা হৌক। নতুবা কোটার মাধ্যমে এভাবে প্রকৃত মেধাবীদের বঞ্চিত করে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন করলে জাতি অনগ্রসর হয়ে পড়বে এবং দেশ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। মুক্তিযুদ্ধের মত একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কোটাব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা আদৌ উচিৎ হবে বলে মনে হয় না। এবিষয়ে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলাপ-আলোচনা করে বিসিএসে সংরক্ষিত কোটাব্যবস্থা বাতিল বা সংস্কার করা যেমন সরকারের একান্ত কর্তব্য তেমনি পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করে নাগরিক হিসাবে তাদের সবার অধিকার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের অত্যন্ত পবিত্র একটি দায়িত্ব। অতএব, বিসিএসে কোটাব্যবস্থা বাতিলের যে যৌক্তিক দাবি নিয়ে ছাত্ররা আজ রাস্তায় নেমেছে তা আমলে নিয়ে এবিষয়ে সরকার দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

-শেখ আব্দুছ ছামাদ
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ আমার ভাগ্যে যেসব অমঙ্গল লিপিবদ্ধ করা আছে তা কি আমি আমার জ্ঞান দিয়ে এর বিপরীত করতে পারব? যারা দুনিয়ায় গযবের শিকার হন, তারা কি ভাগ্যের কারণে হন। দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুল হাসান
এনায়েতপুর মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাক্বদীরে আল্লাহ তা'আলা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু তাক্বদীরে ভাল লিপিবদ্ধ আছে, না মন্দ লিপিবদ্ধ আছে তা কেউ অবগত নয়। ফলে মন্দ কর্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে যেতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ তার তাক্বদীরের মন্দকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের ভাল-মন্দকে ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন *(রা'আদ ৩৯)*। ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপ কর্মের কারণে রূযী থেকে বঞ্চিত হয়। দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তন হয় এবং নেকীর মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৯২৫)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাওয়াফ করতে করতে বললেন, 'হে আল্লাহ! যদি আমার ভাগ্যে মন্দ ও পাপ কর্ম লিপিবদ্ধ থাকে তাহ'লে উহা মিটিয়ে দিন। কেননা আপনি ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন। আপনার নিকট উম্মুল কিতাব রয়েছে। আপনি আমার তাক্বদীরকে কল্যাণময় করুন এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা করুন *(ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী হা/২০৪৭৮, সনদ হাসান, দ্রঃ তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/১৬৫)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নিকট দু'টি কিতাব রয়েছে। একটি কিতাবে যা লিপিবদ্ধ আছে তা তিনি মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর তার নিকট রয়েছে উম্মুল কিতাব *(ইবনু জারীর, হাকেম, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-১৬৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ বিদ্যা অর্জন করা ফরয, বিদ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হ'ল, এটা কি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য? স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যা কি উক্ত ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মুতীউর রহমান
মরিয়ম বাজার হাফেযিয়া মাদরাসা
বাসুলী, খানসামা, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয। আর এটি ইলমে শারঈ বা দ্বীনী ইলম। যা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ইবাদত সমূহ করার মাধ্যম। এ ধরনের ইলম অর্জন করা থেকে বিরত থাকা অবৈধ। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয' *(মির'আতুল মাফাতীহ, হা/২১৯, পৃঃ ২২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৪, সনদ ছহীহ)*। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনে বা উপকারার্থে এর অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করা যায়। যেমন- যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষার জন্য আদেশ করেছিলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫৯, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি জাল *(মিশকাত হা/২১৮ নং এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজনে দূরদেশেও ভ্রমণ করা যায়। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাতের জন্য দূর থেকে বহু দূরে ভ্রমণ করেছিলেন *(কাহফ ৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ মা-বাবা যদি নেক সন্তান রেখে মারা যান এবং মৃত্যুর পরে সন্তানেরা যদি গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহ'লে উক্ত গুনাহের ভাগ কি মা-বাবাকেও বহন করতে হবে? অনুরূপভাবে, সৎ ও পরহেযগার সন্তানের পুণ্যের ভাগ মৃত পিতা-মাতা পাবেন কি?

-মুহাম্মাদ ইমামুল ইসলাম
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি সন্তানদেরকে শারঈ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং সন্তানের জন্য যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করে থাকেন অতঃপর তাদের মৃত্যুর পর সন্তানেরা যদি অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহ'লে পিতা-মাতা গোনাহগার হবেন না। আল্লাহ বলেন, 'একজন আরেক জনের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(ফাত্বির ১৮)*। অপরদিকে পিতা-মাতা যদি দায়িত্ব পালন না করেন এবং সন্তানের অন্যায় কর্মের

সহযোগী হন তবে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জনসাধারণের নেতা তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গৃহকর্তা তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে... *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। কতিপয় সৎকর্মের নেকী মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও তার সৎ কর্মের নেকীর ভাগীদার হবেন। সেগুলো হ'ল শিক্ষার্জন করা এবং শিক্ষা দেওয়া, সুসন্তান রেখে যাওয়া, কুরআনের উত্তরাধিকারী বানানো, মসজিদ নির্মাণ, পথিকের জন্য ঘর নির্মাণ, নদী খনন সহ সুস্থ থাকাবস্থায় যে দান করা হয় তার নেকী মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও পান *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৫৪; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ ১০ বছরে ছালাত ফরয হয় কিন্তু ছাওম কত বছরে ফরয হয়?

-ইয়াছির আরাফাত সজিব
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ছালাতের ক্ষেত্রে ১০ বছরের কথা উল্লেখ থাকলেও শরী'আতের অন্যান্য ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ নেই। তবে সাবালক হওয়ার নিম্নোক্ত আলামতগুলি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে তার উপর ইবাদত ফরয হবে। যেমন (১) গুপ্তাঙ্গে কেশ গজানো (২) প্রবৃত্তির তাড়নায় জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া (৩) নারীদের ক্ষেত্রে হায়েয হওয়া ইত্যাদি *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মতের ৭০ হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা হ'ল ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়ফুঁক করেনি, ফাল গ্রহণ করেনি, দাগ লাগায়নি, যারা শুধু আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে। কোন মুসলিম ব্যক্তি এই হাদীছ জানা সত্ত্বেও ঝাড়ফুঁক করেছিল এবং চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে এই হাদীছের উপর যদি সে আমল করে, তাহ'লে ঐ ৭০ হাযার লোকের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে কি?

-শাহ আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়ে ঝাড়ফুঁক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এই হাদীছের প্রতি আমল করে এবং শুধু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ঐ ৭০ হাযার লোকের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ আমার ছেলে ১৫ বছর বয়সে মারা গেছে। জন্মের পর আমি তার আক্বীক্বা করতে পারিনি। এখন তার আক্বীক্বা করা যাবে কি? নিজেই নিজের আক্বীক্বা করা এবং জন্মের সপ্তম দিন ব্যতীত পরবর্তী দিনের আক্বীক্বা করা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রঊফ
তালবাড়িয়া, আকলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে। এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৬০; মিশকাত হা/৪১৫৩, ৫৮)*। সপ্তম দিনের পরে আক্বীক্বা করার যে হাদীছগুলো এসেছে এর সবগুলোই যঈফ ও জাল *(বুলূগুল মারাম হা/১৩৬০ -এর টীকা দ্রঃ বুলূগুল মারাম, ইতহাফুল কিরাম, পৃঃ ৪০৭)*। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তির আক্বীক্বা করার কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ আমাদের এলাকায় ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন নামে একটি সমিতি আছে। তাদের ঋণ কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত হয়। যেমন- আমি একজন ব্যবসায়ী। টাকার প্রয়োজনে উক্ত সমিতির সদস্য হই। উক্ত সমিতি হ'তে আমাকে ঋণ বাবদ ১০,০০০/= টাকা প্রদান করা হয় এবং সেই টাকার উপর ১২% লাভ বসিয়ে ১২,০০০/= টাকা আমাকে সাপ্তাহিক ভাবে ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলা হয়। আর আমাকে বলা হয় ১২০০০/= টাকার একটি ভাউচার করতে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সূদের পর্যায়ে পড়ে কি?

-আনোয়ার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সম্পূর্ণ সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ টাকা লেনদেনের জন্য শরী'আতে দু'টি বিধান রয়েছে। (১) 'ইশতিরাক' বা শরিকানা ব্যবসা (২) 'মুযারাবা' বা একজনের সম্পদ আর অপর জনের ব্যবসা বা পরিশ্রম *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭১; দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*। প্রশ্নেল্লিখিত পদ্ধতিটি শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতির বিরোধী হওয়ায় তা সূদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ দাবা খেলা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ দাবা, পাশা ও লুডু খেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দাবা বা লুডু খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি দাবা-লুডু খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ আমি কোন ব্যক্তিকে ১০ হাযার টাকা ধার দিব এই শর্তে যে, সে আমাকে এক বছর পরে ১০ হাযার টাকা দিবে এবং ১০ মন ধানও দিবে। শরী'আতে এর বিধান কি?

-ছফিউল্লাহ খান
মহিলা মাদরাসা, রাণীপুরা, কাঞ্চন।

উত্তরঃ উক্ত লেন-দেন সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ঋণ দাতা ঋণের বিনিময়ে তার প্রদত্ত টাকা ফেরত নেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত লাভ স্বরূপ আরও দশমন ধান নিচ্ছে। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সূদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সোনার বিনিময়ে সোনা, চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান, নগদ-নগদ। যে ব্যক্তি বেশী নিবে বা দিবে তা সূদের অন্তর্ভুক্ত। দাতা ও গ্রহীতা গুণাহের দিক দিয়ে উভয়েই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ কোন মহিলা সন্তান গ্রহণের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশঙ্কা থাকলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ সন্তান ধারণে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না' *(মায়েদাহ ৬)*। তবে রিযিকের ভয়ে এবং চেহারার সৌন্দর্য ও লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নয় *(বাণী ইসরাইল ৩১)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ অনেক মাদরাসায় ছাত্রীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে পিটি, গান, গজল ইত্যাদি করানো হয়। শরী'আতে এর বিধান কি?

-হাসিবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টল, মক্তবে, হাসপাতাল এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সহ যাবতীয় ক্ষেত্রে পর পুরুষের সঙ্গে নারীদের সংমিশ্রণ হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীদেরকে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মাহরাম ব্যতীত নারীরা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হয় বা কোন স্থানে মিলিত হয় তখন শয়তানের প্ররোচনায় তারা অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ধাবিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)*। ফলে তারা এক সময় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে *(নূর ৩০-৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে চলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩৩; ফাৎওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ আমাদের এলাকায় কিছু মা'রেফতী ফকীর বলে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। অতএব আমরা ভাল-মন্দ যেসব কাজ করে থাকি সেটার জন্য আল্লাহই দায়ী। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে আমরা ভাল কাজ করতে পারতাম। তাদের এ কথার যথার্থতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, এন.এস সরকারী কলেজ
নাটোর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে' *(আনফাল ৫৩)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই আছে' *(রা'দ ৩৯)*।

অর্থাৎ বান্দার প্রার্থনা এবং সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের পরিবর্তন করেন। উক্ত প্রশ্ন রাসূল (ছাঃ)-কেও করা হয়েছিল। তাতে তারা তাঁকে বলেছিলেন, যেহেতু জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে, সেহেতু আমাদের আমলের কি দরকার হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সত্য পথে থেকে সৎ আমল করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা জান্নাতীদের শেষ আমল জান্নাতী হবে এবং জাহান্নামীদের শেষ আমল জাহান্নামী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটি সহজ হবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়াকফকৃত জায়গা পরিচালনা কমিটি ইচ্ছা করলে বিক্রি করতে পারে কি?

- মাওলানা আব্দুল হালীম
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা দ্বারা যদি উপকৃত না হওয়া যায় তাহ'লে উক্ত জায়গা বিক্রি করে ভাল জায়গা ক্রয় করা যায়। যেমন যুদ্ধ ঘোড়া যদি অকেজো হয়ে যায় এবং তার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপকার না পাওয়া যায় তাহ'লে তা বিক্রি করে ভাল ঘোড়া ক্রয় করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২)*। তবে এমন কাজ করা যাবে না যাতে করে ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস বিক্রিও করা যায় না, হেবাও করা যায় না' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৯১৮ 'ওয়াকফ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ জনৈক মুফতী ফৎওয়া দিয়েছেন যে, স্থানীয় লোকদের জন্য মসজিদের বারান্দায় বা ভিতরে দ্বিতীয় জামা'আত করা মাকরূহে তাহরীমী। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মতীউল্লাহ
কলসিন্দুর বাজার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী। একই মসজিদে একই ছালাতের একাধিক জামা'আত অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায়ের পর এক ব্যক্তি আসল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কে আছ যে, এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করবে? অর্থাৎ তার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করে তাকে ছাওয়াবের অংশীদার করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী হা/২২০, সনদ ছহীহ)*। অপর বর্ণনায় আছে, কোন্ ব্যক্তি এই লোককে ছাদাক্বা করবে এবং তার সাথে ছালাত আদায় করবে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ যারা ৩ বা ৪ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তারা কি ছালাত আদায়ের ছাওয়াব পাবে? ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তি যদি দান করে অথবা কুরআন তেলাওয়াত সহ বিভিন্ন ভাল কাজ করে তাহ'লে সে কি তার ছওয়াব পাবে?

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফের। কারণ সে ছালাতের ফরযিয়াত অস্বীকারকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের এবং তাদের (অমুসলিম) মাঝে অঙ্গীকার হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৪)*। আর যারা অলসতা করে ছালাত ছেড়ে দেয় তবে ছালাতের ফরযিয়াত স্বীকার করে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। একদল মনে করেন তারা কাফের হবে। কারণ তারা ফরয ছালাত ত্যাগ করল। কতিপয় আলেম বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত না ছাড়লে কাফের হবে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৫১)*। আর যারা ছালাত আদায় করে না কিন্তু দান-ছাদাক্বা সহ অন্য ভাল কাজ করে তাদের কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(সূরা ফুরক্বান ২৩; ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১১০; ছহীহ মুসলিম ১/১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়ে'ন করা এবং সশব্দে আমীন বলার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, আর সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাফউল ইয়াদায়েন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-সানোয়ার
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ'তে ওঠাকালীন সময়ে এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় 'রাফউল ইয়াদায়েন' করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)*। 'রাফউল ইয়াদায়েন করার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ *(মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী, সিফরুস সাদাত (ফার্সী থেকে উর্দু), পৃঃ ১৫)*।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই *(ফৎহুল বারী ২/২৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ইমাম 'আমীন' বলেন কিংবা 'ওয়ালায-যা-ল্লীন' পাঠ শেষ করেন, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' ফেরেশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬০-৬৫)*। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত উত্তোলন করতে বললেন যেন বগলের পুতুল (মূর্তি) পড়ে যায় এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ বানাওয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে আমার আম্মা মারা যান। জীবিত থাকাকালীন সময়ে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে ছবি উঠান। মৃত্যুর পর সেই ছবি রেখে দেওয়া যাবে? এ কারণে তার কোন শাস্তি হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
গোমাস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন প্রাণীর ছবি উঠানো এবং তা সংরক্ষণ করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। তা ক্যামেরা দ্বারা উঠানো হোক অথবা হাত দ্বারা আঁকানো হোক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৬৬৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি অংকনকারী জাহান্নামী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন ঐসব ব্যক্তিদের শাস্তি কঠোর করা হবে, যারা ছবি অংকন করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

অনুরূপভাবে ছবি দেওয়ালে লটকিয়ে রাখা বা অ্যালবামে সংরক্ষণ করাও হারাম *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৩৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না যে ঘরে ছবি থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। অতএব মৃত ব্যক্তির ছবি নিছক দেখার জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না। মৃত ব্যক্তি যদি ছবি সংরক্ষণের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহ'লে তিনি গুনাহগার হবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সরকারী কোন কাজের জন্য ছবি সংরক্ষণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ ওযূ অবস্থায় কোন বেগানা পুরুষকে দেখলে এবং ঐ বেগানা পুরুষ মহিলাকে দেখলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-নাঈমা বিনতে শামসুল হক
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ওযূ অবস্থায় কোন বেগানা পুরুষকে দেখলে অথবা ঐ বেগানা পুরুষ তাকে দেখলে ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বেগানা পুরুষ যেন দেখতে না পায় এমন স্থানে মহিলাদের ওযূ করা সমীচীন নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ আমরা জানি ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে সুন্নাত-নফল ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। সে মতে যোহরের চার রাক'আত সুন্নাতের তিন রাক'আত শেষে ইক্বামত শুরু হওয়ায় সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'লে এবং পরক্ষণে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিলে মাঝখানের অসমাপ্ত তিন রাক'আত সুন্নাতের কোন নেকী পাওয়া যাবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেহেতু ছালাত সম্পন্ন হয়নি তাই এর ছওয়াব আশা করা যায় না। তারপরও আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। তবে উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জামা'আতে শরীক হওয়ার মধ্যেই অনেক নেকী রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ মাইকে আযান দিলে 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ' বলার সময় মুয়াযযিনকে মাথা ঘুরাতে হবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
উত্তর জোয়ানী, মণ্ডলপাড়া
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ আযান মাইকে দেওয়া হোক বা মুখে দেওয়া হোক মুয়াযযিনকে 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ' বলার সময় ডানে এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ' বলার সময় বামে মুখ ঘুরাতে হবে। আবু যুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে আযানের সময় দেখেছি, তিনি 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ ও ফালা-হ' বলার সময় যথাক্রমে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতেন *(বুখারী ও মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল, ১ম খণ্ড, হা/২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে জমি দান করেছে। এখন প্রতি বছর লিজ নিয়ে ফসল উৎপাদন করছে। এভাবে দানকৃত জমি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়ে ফসল ভোগ করা যাবে কি?

-আযীযুল হক
কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ দানকৃত জমি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে লিজ নিয়ে ফসল উৎপাদন করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩০৮)*। তবে দানকৃত জমি পুনরায় দানকারী ক্রয় করতে পারবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০১৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে কি? ছালাতে চোখ বন্ধ করে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয বা সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। তবে কেউ ইচ্ছা করলে শেষের দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়তে পারে, যা কখনো কখনো রাসূল (ছাঃ) যোহরের ফরয ছালাতে করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৯)*।

ছালাতে চোখ বন্ধ করে ক্বিরাআত পড়া যাবে না। কারণ ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে চোখ বন্ধ করতেন না। যেমন তিনি তাশাহহুদের বৈঠকের সময় শাহাদত আংগুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি নকশাযুক্ত চাদর ছিল, যা তিনি দেয়ালে পর্দা হিসাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার নকশাযুক্ত চাদর এখান থেকে উঠাও। নিশ্চয়ই উহার নকশা সর্বদা আমার ছালাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে *(বুখারী ১/৪০৮)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি ছালাতে চোখ বন্ধ করতেন না *(যাদুল মা'আদ ১/২৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করার গুরুত্ব কী? স্ত্রী কোথায় দাঁড়িয়ে ছালাত পড়বে?

-আব্দুছ ছবূর চৌধুরী
সিলেট।

উত্তরঃ একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*। সুতরাং কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারলে বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করলে তাতে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে অবশ্যই বেশী নেকী হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৬০)*। স্বামী-স্ত্রী একত্রে ছালাত আদায় করলে স্বামীর পিছনে স্ত্রী দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম কাতার হ'ল পুরুষের কাতার প্রথমে হওয়া। সর্বনিকৃষ্ট কাতার পুরুষের কাতার পিছনে হওয়া। মহিলাদের কাতার পিছনে হওয়া সর্বোত্তম এবং প্রথমে হওয়া সর্বনিকৃষ্ট *(আবুদাঊদ হা/৬৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি কোন পাপের কারণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করেছিল যে, সে কোনদিন আর এই পাপ কাজ করবে না। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় সে ঐ পাপ কাজ করে বসে। প্রশ্ন হ'ল, শপথ ভঙ্গ করার কারণে ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করা হ'ল কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ শপথ ভঙ্গ করার কারণে ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করা হয়নি। তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করে উক্ত পাপ কাজ থেকে ফিরে আসতে হবে। এর কাফফারা হ'ল, দশ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা পরিবারকে খাওয়ানো হয় অথবা সমপরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রদান করা। অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। সম্ভব না হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ করার পর তার নামের প্রথমে 'আলহাজ্জ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ মাস'ঊদ
শিকটা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হজ্জ সম্পাদন করার পর নামের সাথে 'আলহাজ্জ' ব্যবহার করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা ব্যবহারের ব্যাপারে শারঈ কোন বিধান নেই।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক নামা পাঠায়। কিন্তু স্ত্রী তা গ্রহণ না করে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। ফলে স্বামীর ৪ মাস জেল হয়। ফলে স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হ'ল, স্ত্রীকে গ্রহণ করা ঠিক হয়েছে কি? তাদেরকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে কি?

-হাফীয শেখ
খানজাহান আলী, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে চাই তা মৌখিক বা লিখিত হোক, স্ত্রী তা গ্রহণ করুক আর না করুক তা তালাক বলে গন্য হবে। প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী তালাকনামা গ্রহণ না করলেও এক তালাক হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এক্ষণে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, দুই তালাক পর্যন্ত রাজ'আত বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে হ'লে নতুন করে বিবাহের প্রয়োজন হয় না। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে আর ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। যতক্ষণ না অন্যত্র তার স্বেচ্ছায় বিবাহ হয় এবং নতুন স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় *(বাক্বারাহ ২২৯)*। উল্লেখ্য, প্রচলিত 'হিল্লা' প্রথা সম্পূর্ণ হারাম *(ছহীহ নাসাঈ ১/৩১৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ বিদ্যালয় সমূহ এমনকি মাদরাসার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক অথবা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রবেশ কালে অথবা অভিষেক অনুষ্ঠানে কিংবা প্রশিক্ষণ কক্ষে অতিথি বা প্রশিক্ষক প্রবেশ কালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, এটা কি শরী'আত সম্মত?

-রিয়াযুদ্দীন
বিদ্যাপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। ছাহাবায়ে কেরামই তাকে বেশী শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু যখন তিনি ছাহাবীদের নিকট আগমন করতেন তখন তারা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, এটা তিনি অপসন্দ করেন *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*। সুতরাং শিক্ষকদের উচিত নয় যে, তারা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশকালে তাদের জন্য ছাত্রদেরকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিবেন। আর ছাত্রদের ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৪৬৯৯)*। সম্মানার্থে না দাঁড়ানোর কারণে যারা অন্যকে তিরস্কার করে তাদের উচিত এ ধরনের শরী'আত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং আল্লাহ আসমানে থাকেন (ছহীহ মুসলিম)। উক্ত কথার ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হক
চাঁদপুর, পীরগঞ্জ, নাটোর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন *(ত্বহা-৫)*। তিনি সেখান থেকেই সারা বিশ্ব পরিচালনা করছেন। কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কড়া পর্যবেক্ষণকারী। তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তার ইলম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত *(হাদীদ ৪)*। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সকলের সাথে সর্বত্র বিরাজমান *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৩ তম খণ্ড, সূরা হাদীদ ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৪০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আল্লাহর জন্য যারা একে অন্যকে ভালবাসে, তারা ক্বিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণ তাতে ঈর্ষা করতে থাকবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবূ শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটির সনদ হাসান ছহীহ *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৯০; মিশকাত হা/৫০১১)*। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছে মূলতঃ শাহাদাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চায় কিন্তু স্বামী তা গ্রহণ না করে তিন বছর নিখোঁজ ছিল। তিন বছর পর স্বামী এসে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। প্রশ্ন হ'ল, তারা এখন সংসারী হ'তে পারবে কি?

- নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি ক্বাযীর মাধ্যমে 'খোলা' না করে থাকে তাহ'লে সে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবেই আছে। তাই তারা এমনিতেই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সংসার করতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ স্বামীও তালাক দেয়নি এবং স্ত্রীও খোলা করেনি। আর যদি ক্বাযীর মাধ্যমে স্ত্রী 'খোলা' করে থাকে তাহ'লে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ পাসপোর্ট করতে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তাকে টাকা না দিলে পাসপোর্ট হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পাসপোর্ট করা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম
নদীয়া, পশ্চিমবাংলা, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা প্রদানে অসুবিধা নেই। কারণ নিজের হক্ব আদায়ের জন্য এবং অত্যাচারীর অত্যাচার দমন করার জন্য কাউকে টাকা প্রদান করার নাম ঘুষ নয়। বরং অন্যের হক্ব হরণ করার জন্য কাউকে টাকা প্রদান করার নাম ঘুষ *(ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, পৃঃ ১৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ আমি মৌ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। মৌ মাছি তিন প্রকার। (১) শ্রমিক মাছি (২) রাণী ও (৩) পুরুষ মাছি। পুরুষ মাছি শুধু চাকের মধু খায়। তাই চাকে যখন মধু বেশী থাকে তখন আমরা পুরুষ মাছি মেরে ফেলি। এতে মধুর উৎপাদন অনেক বেশী হয়। এভাবে পুরুষ মাছি মারা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম
পালোপাড়া, খুজীপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার প্রকার প্রাণীকে মারতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে মৌমাছি অন্যতম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার প্রকার প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন (১) পিঁপড়া (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ পাখী (৪) ছরফ (এক প্রকার পাখী) *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৫২৬৮)*। সুতরাং উক্ত কারণে মৌমাছি মারা যাবে না। তবে সাময়িকভাবে তাকে আটকিয়ে রাখার পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাফিরূন পড়বে তার জন্য তা কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান হবে। কিন্তু 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়' বইয়ে লিখা আছে, 'সূরা যিলযাল অর্ধ কুরআন এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের ৪ ভাগের এক ভাগ' মর্মে হাদীছটি যঈফ। দু'টির মধ্যে কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা কাফিরূন সংক্রান্ত হাদীছটি ছহীহ যা আত-তাহরীকে উল্লেখ করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৮৯৩-২৮৯৪)*। তবে 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়ে' বইয়ে যে হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে সেটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৫)*। কারণ সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেক মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে শুধু সে অংশটুকু যঈফ *(তিরমিযী হা/২৮৯৩-২৮৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ আমাদের গ্রামের ঈদগাহ চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে। কিন্তু ঈদগাহের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে গোরস্থান আছে। জনৈক আলেম বলেন, এই ঈদগাহে ঈদের ছালাত হবে না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওমর ফারূক
চারঘাট, রাজশাহী।

Contents

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। কারণ কবরকে সামনে রেখে ছালাত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০৫০, ছহীহ আবুদাঊদ ৩২২৯)*। তবে মসজিদ বা ঈদগাহের প্রাচীর ব্যতীত পৃথক প্রাচীর দ্বারা কবরস্থানকে আলাদা করা হ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(দ্রঃ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১তম খণ্ড)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ প্রস্রাব করার পর পাক হওয়ার জন্য কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান আছে কি?

-ছফিউল্লাহ খান
রাণীপুরা, কাঞ্চন, ভারত।

উত্তরঃ প্রস্রাব করার পর কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান নেই। পানি থাকা অবস্থায় কুলুপ ব্যবহারেরও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। কুলুপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একপ্রকার বেহায়াপনা বৈ কিছুই নয়। তাই মাওলানা আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর কুলুপ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' *(তা'লীমুদ্দীন)*। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা-বসা করা ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত *(ইগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে নাকি হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?

-আব্দুছ ছবুর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহে যাতায়াতের যার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ্জ পালন করা ফরয' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ চুরিকৃত মাল ক্রয় করা যাবে কি?

-নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ জেনেশুনে চুরিকৃত মাল ক্রয় করা যাবে না। কারণ এতে পাপ কর্মে সহযোগিতা করা হয়। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন'। এটা কি সঠিক?

-মাওলানা আলতাফ হুসাইন
কদমতলা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি বিভিন্ন জায়গায় লিখে সরকারীভাবে প্রচার করা হ'লেও এটি হাদীছ নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯০০)*। সুতরাং সরকার গাছ লাগানোর জন্য যে উৎসাহ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের সকলকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং বেশী বেশী গাছ লাগানো উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ অনেক মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকে। এসমস্ত মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?

-বসীর আল-হেলাল
জিওলজি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' একটি পবিত্র বাক্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সর্বোত্তম যিকর বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬)*। অতএব উক্ত পবিত্র বাক্য লেখা সম্বলিত মোবাইল সেট নিয়ে বাথরুমে গমন তো দূরের কথা উক্ত বাক্য মোবাইল সেটে লেখাই উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত পবিত্র কালেমার অবমাননা করা হয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ কবরে ফুল দেওয়া যায় কি? কোন শহীদের কবরে কেউ ফুল দিলে শহীদের কোন ক্ষতি হবে কি? ফুল প্রদানকারীর কি অবস্থা হবে?

-আতীকুর রহমান
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কবরে ফুল দেওয়া কুসংস্কার *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*। শহীদের কবরে ফুল দিলে শহীদের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ তিনি এ ব্যাপারে কাউকে নির্দেশ দিয়ে যাননি। তবে অর্পণকারী অবশ্যই গোনাহগার হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের আপোষহীন বক্তব্য

'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বই থেকেঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত উক্ত বইংটি মাসিক **আত-তাহরীক** জুলাই ২০০৩ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ 'দরসে কুরআনে' 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর মার্চ ২০০৪ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত বইয়ে তিনি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্য বিধৃত হ'লঃ

⇨ 'জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তাই 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র' *(ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ২৭)*।

⇨ 'তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হ'ল সবচেয়ে বড় 'জিহাদ'। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁদের উপর নেমে এসেছিল বাধা ও বিপদের হিমালয় সদৃশ মুছীবত সমূহ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইবরাহীমকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তরতাজা নবী যাকারিয়াকে সর্বসমক্ষে জীবন্ত করাতে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। মূসাকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। ঈসাকে পৃথিবী ছেড়ে আসমানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমাদের নবীকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় অবস্থান নিতে হয়েছে। কারণ তাঁরা স্ব স্ব যুগের লোকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকী আক্বীদার সংস্কার ও সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই অস্ত্র হাতে নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হননি। বরং যখনই শিরকের শিখণ্ডীরা অস্ত্র হাতে তাদেরকে উৎখাতের জন্য উদ্যত হয়েছে, তখনই তাওহীদের অনুসারীগণ তাদের মুকাবিলায় হয় তাদের জীবন দিয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করেছেন, শহীদ অথবা গাযী হয়েছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধই হয়েছে মদীনায় আত্মরক্ষামূলক। যদি আক্রমণমূলক হ'ত, তাহ'লে এসব যুদ্ধ মক্কায় সংঘটিত হতো এবং তখন রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলেনি। বাস্তব কথা এই যে, যবরদস্তির মাধ্যমে একজনকে সাময়িকভাবে পদানত করা যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে অনুগত করা যায় না। ইসলাম আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নাযিলকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এ দ্বীন মানবজীবনকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে চায়। অতএব দ্বীন কায়েমের নামে কিংবা জিহাদের নামে আমরা যেন অতি উৎসাহে এমন কিছু না করি, যা ইসলামের মূল রূহকে ধ্বংস করে দেয়' *(ঐ, পৃঃ ২৮)*।

⇨ 'তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমে'র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদে'র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা' *(ঐ, পৃঃ ৩১)*।

⇨ 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ...মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে' *(ঐ, পৃঃ ৩৩)*।

⇨ 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, পৃঃ ৩৫)*।

⇨ 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক-এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*।